প্রোডাক্টিভিটি লেসনস

মুসলিম জীবনের সাফল্যসূত্র

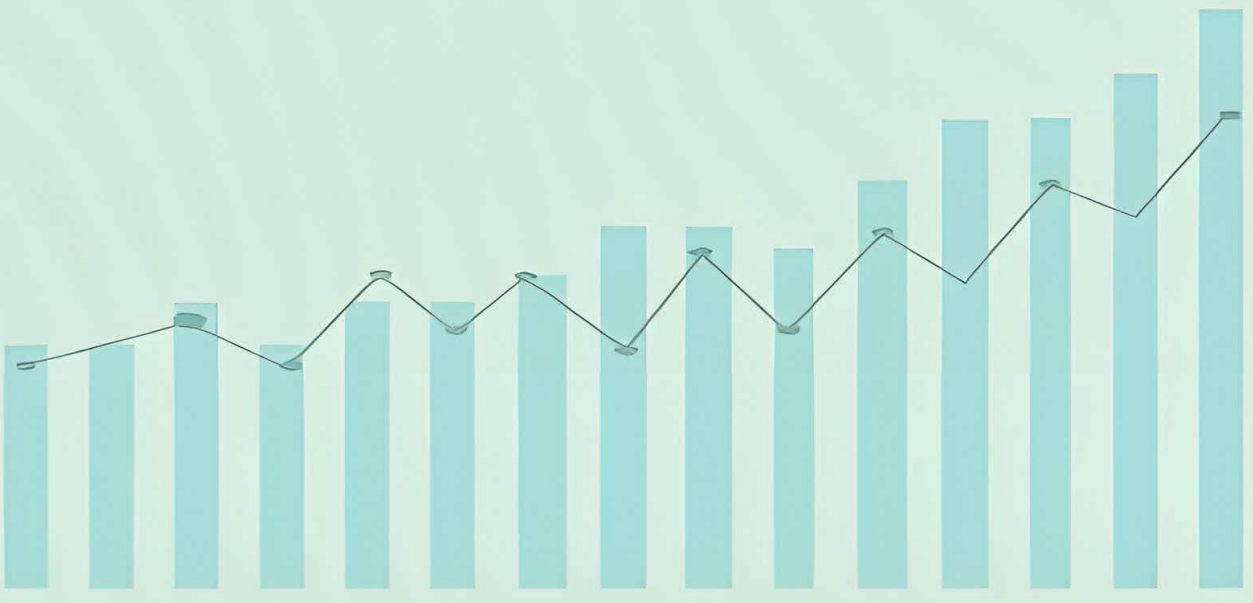

শহিখ মাশআল আব্দুল আজিজ আল-ফাল্লাহি

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

MDH

প্রোডাক্টিভিটি লেসন্স

মুসলিম জীবনের সাফল্যসূত্র

MDH

বই :	প্রোডাক্টিভিটি লেসন্‌স
লেখক :	শাইখ মাশআল আব্দুল আজিজ আল-ফাল্লাহি
অনুবাদ :	আব্দুল্লাহ মজুমদার
ভাষা সম্পাদনা :	আতিয়া আবেদীন নাবিলা, তাজরিন আলম আয়াজ
শারয়ি সম্পাদনা :	উস্তায আবুল হাসানাত কাসিম, উস্তায আব্দুল্লাহ মাহমুদ
বানান ও ভাষারীতি :	যাহিদ আহমাদ, মাহবুবুর রহমান
প্রচ্ছদ :	সমকালীন গ্রাফিক্স টীম

প্রোডাক্টিভিটি লেসন্স

মুসলিম জীবনের সাফল্যসূত্র

MDH

সমকালীন প্রকাশন

প্রোডাক্টিভিটি লেসন্‌স

শাইখ মাশআল আব্দুল আজিজ আল-ফাল্লাহি

প্রথম প্রকাশ

আগস্ট ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মুদ্রণ

স্বরবর্ণ প্রিন্টিং এন্ড প্রেস

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৪০৯-৩০৪০৫০

একমাত্র পরিবেশক

লেভেল আপ পাবলিশিং

১১/১, পি কে দাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

ISBN: 978-984-95663-2-8

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 152.00 US $5.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোনঃ ০১৪০৯-৮০০-৯০০

প্রকাশকের অনুভূতি

বাবা, মন দিয়ে পড়। সামনে তোর পরীক্ষা!

ছেলেবেলায় মায়ের মুখে কতবার যে শুনতে হয়েছে এই কথাটি, তার হিসেব নেই। যেকোনো কাজ মনোযোগ দিয়ে করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে সফল হতে হলে মনোযোগের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু সমস্যা হলো, কাজে আমাদের মন বসে না। কাজ করার সময় মাথার ভেতর শুধু অপ্রয়োজনীয় ভাবনাগুলো ঘুরপাক খেতে থাকে। ফেসবুক, টুইটার, লাইক আর কমেন্টের ভিড়ে মন দিয়ে কাজ করাটা এখন বলতে গেলে অসম্ভব!

কারো জীবনে যদি লক্ষ্য না থাকে, তবে সে হালবিহীন নৌকার মতো এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করে। কাজে মন বসানো তখন বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। জীবনে সফল হতে হলে প্রথমে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। তারপর সে লক্ষ্য অনুযায়ী সামনে এগুতে হয়। পাশাপাশি ফেসবুক আর সোশাল মিডিয়ার মতো সময়-খাদকের কাছ থেকে শত হাত দূরে থাকতে হবে। নইলে যে মনোযোগ ধরে রাখা বেজায় মুশকিল। বিক্ষিপ্ত চিন্তা, অস্থির মন আর হতাশায় আচ্ছন্ন ভগ্ন হৃদয় জাতির জন্য কখনো কল্যাণকর কিছু বয়ে আনতে পারে না।

ড. মাশআল আব্দুল আজিজ আল-ফাল্লাহির *প্রোডাক্টিভিটি লেসনস* বইটি পাঠকদের জীবনে কেবল সফলতাই বয়ে আনবে না, বরং হৃদয়টাকে আল্লাহমুখী করে দেবে। এমন একটি বই সমকালীন প্রকাশন থেকে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত,

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এ বইটিকে কাল হাশরের ময়দানে আমাদের জন্য নাযাতের অসিলা বানিয়ে দিন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

MDH

অনুবাদকের অনুভূতি

আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসিরা!

বর্তমান সময়টাকে অনেকে ব্যস্ততার যুগ বলে অভিহিত করে থাকেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, পড়াশোনা-খেলাধুলা নানারকম কাজকর্মে মানুষ এখন প্রচণ্ড ব্যস্ত। এর সাথে আবার যুক্ত হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম, যা মানুষকে কর্মজীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার পাশাপাশি কেড়ে নিচ্ছে সবার মূল্যবান সময়। আধুনিক ভোগবাদী সমাজে আমাদের চিন্তাচেতনা আর কর্মকাণ্ড এখন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এসব সোশাল মিডিয়া দ্বারা। তাই নির্দিষ্ট কোনো কাজে মনোযোগ ধরে রাখা দিনকে দিন বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

খুব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আজকাল মানুষজন একটানা বেশিক্ষণ তাদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। একনিষ্ঠ হয়ে কোনো একটি কাজে মন বসাতে চায় না। এক কাজ শুরু করলে আরেক কাজের চিন্তা এসে বাগড়া দেয়। পড়ালেখা কিংবা কাজকর্মে একাগ্রচিত্তে লেগে থাকার মানসিকতা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তাই ইতিহাসের পাতায় আমরা বিভিন্ন সফলতার যেসব ঘটনা পড়ে থাকি, সেসব যেন আজ সোনার হরিণ। অতীতের তুলনায় আজ আমাদের অর্জনটাও বড্ড বেশি নগণ্য। একটি বই পড়তে গেলেও বেশ কয়েকবার ফেসবুকে লগ-ইন করতে হয়। একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়েও বার কয়েক উঠে যেতে হয়। এই যে এত মনোযোগের ঘাটতি, এত বেশি অস্থিরতা—এসব আমাদের কর্মদক্ষতা এবং বড় কিছু অর্জনের পথটিকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

প্রতিটি মুসলিমের জন্য কুরআন-সুন্নাহর বাণীগুলো অনুসরণ করা আবশ্যকীয় একটি কাজ। পূর্বসূরিরা এসব বাণী যেভাবে তাদের জীবনে ধারণ করেছিলেন, এ জামানার মুসলিমদেরও উচিত সেভাবে নিজেদের গড়ে তোলা। মুসলিমদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিপুল অর্জনের কাহিনি শুনতে পাই আমরা। আরো শুনতে পাই, আমাদের পূর্বসূরি ইমামগণ কীভাবে তাদের জীবনকে সুন্দর ছকে সাজিয়ে নিয়েছেন, কীভাবে লক্ষ্যের পানে অবিরাম ছুটে চলেছেন। তাদের কাজেকর্মে মনোযোগের যে বৃহৎ একটি ভূমিকা, তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে একজন মানুষ কীভাবে মনোযোগ ধরে রাখবে তা এখন বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের জীবনকে আরো বেশি গতিময় করে তুলতে, ইহকালকে পরকালের জন্য শক্তিশালী এক সোপান হিসেবে গড়ে তুলতে, প্রতিটি কাজে পরিপূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখতে ড. মাশআল আব্দুল আজিজ আল-ফাল্লাহি বহু বছর ধরে লেখালেখি করে যাচ্ছেন। তার লেখা *আত-তারকিয* এমনই একটি বই। তিনি তার নান্দনিক ভাষায়, সাহিত্যিক ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন মনোযোগ ধরে রাখার হাজারো কৌশল। ইসলামের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলি। পাশাপাশি আধুনিক সমাজেরও বেশ কিছু চিত্র উঠে এসেছে এখানে।

এ সময়ের জনপ্রিয় মোটিভেশনাল বইগুলোর প্রতি লেখকের আস্থা রয়েছে, যা তিনি ফুটনোটের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। সর্বোপরি, এ বইটি পাঠকমহলে কার্যকরী এক ঔষধ এবং উপকারী একটি বই হিসেবে স্বীকৃতি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। *জীবন পথে সফল হতে* নামক বইয়ের পর প্রায় একই বিষয়ের ওপর রচিত এটি আমার দ্বিতীয় অনূদিত বই। দুটি বই-ই প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রকাশনী 'সমকালীন প্রকাশন'। আমি এ প্রকাশনীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দুআ করি, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন।

মহান আল্লাহর কাছে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন আমার এই কাজটি কবুল করে নেন এবং এ অসিলায় আমাকে নাজাত প্রদান করেন, আমাকে তাঁর রহমতের মাঝে শামিল করে নেন, বিচার দিবসের ভয়াবহ মুহূর্তে আমাকে তাঁর আরশের ছায়ায় জায়গা করে দেন। তিনিই মহান দাতা। আমরা তো কেবল তাঁরই অনুগ্রহের ভিখারী।

আব্দুল্লাহ মজুমদার

৬ যিলকদ, ১৪৪২ হিজরি

অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

আত্মোন্নয়ন ও ব্যক্তিত্বের গঠন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুমহান এক উদ্দেশ্য নিয়ে নশ্বর মানুষের এই ধুলোমাটির ধরণিতে আগমন। আর তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে আত্মোন্নয়নের বিকল্প নেই।

প্রবল স্রোতের মুখে দীর্ঘস্থায়ী বাঁধ দেওয়া, হতোদ্যম হৃদয়ে আশার সুললিত গুঞ্জরণ ছড়িয়ে দেওয়া এ বইয়ের উদ্দেশ্য। প্রিয় পাঠক, আপনি হয়তো বইটিতে এমন কিছু পেয়ে যেতে পারেন যা আপনাকে জীবনে চলার পথে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নিরন্তর এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

বিক্ষিপ্ততার চরম পর্যায়ে আমরা পৌঁছে গেছি। এমন বিক্ষিপ্ত মানসিকতা আমাদের অনেক লক্ষ্য অর্জনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদেরকে পরিণত করেছে তুচ্ছ, গুরুত্বহীন ব্যক্তিতে। অফুরন্ত অর্থকড়ি আর সীমাহীন সময় থাকা সত্ত্বেও নির্জীব হয়ে, আলস্যের চাদরে নিজেকে আবৃত করে সুখনিদ্রায় কাটিয়ে দিচ্ছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কিংবা বছরের পর বছর—এমন মানুষ অগণিত।

আপনার সময়ও যে প্রতিনিয়ত কী নিদারুণ হেলায় হারিয়ে যাচ্ছে কালের অতল গহ্বরে, সে কথা আপনার চেয়ে ভালো আর কে জানে? অন্য সব বিষয়ের কথা এখন নাহয় দূরেই থাক, কেবল সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমই তো আমাদের সাফল্যের

পথটিকে রুদ্ধ করে দেবার জন্য যথেষ্ট।

মনোযোগ এমন এক বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে একজন মানুষ তার ভেতরকার শক্তিকে অনুভব করতে পারে, টালমাটাল জীবনে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারে। এর মাধ্যমে একজন মানুষ তার সক্ষমতার সবটুকু কাজে লাগাতে পারে। একাগ্র থাকার মাধ্যমে সে ঘুটঘুটে অন্ধকারেও সঠিক পথ চিনে নিতে পারে। আজকের দুনিয়ার নানা অপ্রয়োজনীয় বিষয়, বিভিন্ন প্রকারের বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করা সম্ভব হয় তার পক্ষে। একজন মানুষ যদি একনিষ্ঠতা ধরে রাখতে পারে, তবেই সে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

আমি আপনাকে আহ্বান করব এ বইয়ের অধ্যায়গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্য; যাতে বুঝতে পারেন, কীভাবে মনোযোগী হওয়ার অভ্যাস মানব-চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

যে হরফ আপনাকে সম্মানের আসনে বসায়, যে বই আপনাকে জীবনের পথ দেখায়, যে কলম আপনার পথকে আলোকিত করে; তা আপনার কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে উত্তম নয় কি? আপনি যদি ভেবে থাকেন, নিজের উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন পূরণ করা একেবারে অসম্ভব, তাহলে জেনে রাখুন, আপনার ধারণা ভুল। আল্লাহ আপনাকে সময়ের মতো মহামূল্যবান সম্পদ অযথা নষ্ট করার জন্য উপহার দেননি!

ড. মাশআল আব্দুল আজিজ আল-ফাল্লাহি

বিলাদুল হারামাইন, আল-কুনফুযা, হুলি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

মনোযোগ : এক অমূল্য রতন

মনোযোগ : কী ও কেন ১৩

সময় আপনার কাছে কতটুকু মূল্যবান ১৫

মনোযোগ কেন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ১৬

মনোযোগের নিগূঢ় তত্ত্ব ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাজের মাঝে কীভাবে মনপ্রাণ ঢেলে দেবেন

আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই ২১

ক্রস চিহ্নের সন্ধানে ২৩

কোথায় আপনি ক্রস দেবেন? ২৪

ঝেড়ে ফেলুন সব অস্থিরতা ২৬

জীবনে আপনি কী হতে চান ২৭

লিখিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া লিখিয়ো না ৩০

লক্ষ্যবিহীন জীবন যেন এক হালবিহীন নৌকা ৩৩

গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আগে শেষ করুন ৩৫

অল্প কাজে বেশি ফায়দা ৩৮

অল্প হলেও নিয়মিত ৩৮

'না' বলতে লজ্জা কীসের? ৪১

লেগে থাকুন চর্চার সাথে ৪৪

স্বপ্ন এবার সত্যি করুন ৪৬

মোক্ষম সময় ৫০

বিশ্রাম সাফল্যের সোপান ৫২
ছুড়ে ফেলুন বিশৃঙ্খলা ৫৪
আজকের কাজগুলো আজই করে ফেলুন ৫৬
কাজগুলো সব সহজ করুন ৫৯
আশায় আশায় দিন কেটে যায় ৬১
অভ্যাসের শত উপকার ৬৩
ধনুকভাঙা পণ ৬৫
দায়িত্ব নিতে শিখুন ৬৭
সঙ্গদোষে লোহা ভাসে ৬৯

তৃতীয় অধ্যায়

মনোযোগের কিছু উদাহরণ

ইতিহাসের সোনালি পাতা ৭৩
ভীনদেশি মানুষের সফল জীবন ৭৫
কেমন হতে পারে আপনার অনুশীলন ৭৮
আরও কিছু বিস্ময়কর উদাহরণ ৮০
জ্ঞানীরা যেভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন ৮২
সমাজকল্যাণে মনোযোগের গুরুত্ব ৮৫

চতুর্থ অধ্যায়

মনোযোগ : ভারসাম্যের প্রয়োজনে ও রবের সান্নিধ্যে

শেষ পাতার আগের কথা ৮৯
ভারসাম্যে পরিপূর্ণ এক জীবন ৯৩
মনোযোগ লাভের কার্যকরী পন্থা ৯৪

MDH

প্রথম অধ্যায়

মনোযোগ : এক অমূল্য রতন

মনোযোগ : কী ও কেন

ধুলোমলিন মুসহাফটি পড়ে থাকে শেলফের এক কোনায়, অযত্নে অবহেলায়। যা আমাদের প্রতিদিনকার সঙ্গী হওয়ার কথা, সেই কুরআন যেন আজ বড্ড সেকেলে, অচেনা অজানা। বরকতময় সময়গুলো কেটে যায় ঘুমের ঘোরে। ছন্নছাড়া জীবনটার গতি ফিরিয়ে আনতে দ্বিধা কাটিয়ে মুসহাফের ধুলো ঝেড়ে বসতেই বেজে ওঠে স্মার্টফোনের টুংটুং শব্দ। কোনোটা ম্যাসেঞ্জারে বার্তা আসার সংকেত, কোনোটা আবার সদ্য প্রসবকৃত পোস্টে কারো কমেন্টের সংকেত। আল্লাহর বাণীর সাথে সংযোগ স্থাপন যেন এ জামানায় কঠিনতর এক কাজ! স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টির সাথে সংযোগ স্থাপনে আমাদের সবটুকু মনোযোগ বিনিয়োগ করে বসে আছি আমরা! মূল লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত, এমন কতশত লক্ষ্য মৃগতৃষার মতো অপূরণীয় বিভ্রম হয়ে আছে আমাদের চোখের সমুখে।

লক্ষ্য অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় গুণ হলো আল্লাহর ইচ্ছায় সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারা। সময়ের সদ্ব্যবহার একমাত্র একাগ্রতা ধরে রাখলেই সম্ভব; নতুবা এক কাজের মাঝে হাজারো চিন্তা আমাদের প্রতিনিয়ত বিক্ষিপ্ত করে দেবে। সাফল্য তখন যোজন মাইল দূরে থেকেই হারিয়ে যাবে।

উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজের সবটুকু সময়, চিন্তা আর অনুভূতিকে ব্যবহার করতে এক পায়ে খাড়া—এমন মানুষের অভাব নেই। কিন্তু বাস্তবতার কাছে বেশিরভাগ মানুষই হার মানে, ব্যর্থ হয় সময়কে কাজে লাগাতে। যা-ও একটু পারে, তা-ও সময়ের উচ্ছিষ্টকে কাজে লাগিয়ে। তাই পথের শুরুতেই তারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে দ্বীনহীন অবস্থায় মারা পড়ে।

লক্ষ্য অর্জনের পেছনে আপনি আপনার সবটুকু সময় ব্যয় করবেন—এটাই মনোযোগ। সবটুকু না হলেও অন্তত বেশিরভাগ সময় বরাদ্দ রাখতে হবে সেই কাজে। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই গন্তব্যে পৌঁছনোর নেশা আপনাকে তাড়া করে বেড়াবে। দুনিয়ার কোনো বাধাই তা থেকে দূরে রাখতে পারবে না।

মনোযোগ বা একাগ্রতার অর্থ হলো—আপনি প্রতিটা দিন আপনার বৃহৎ লক্ষ্য অর্জনে অল্প করে হলেও এগোবেন এবং সেই স্বার্থে ছাড় না দেওয়ার মানসিকতা পোষণ করবেন।

জীবনের প্রতিটি দিন নতুন নতুন বিষয় আমাদের সামনে হাজির হয়। অনর্থক সব কাজ পদে পদে আমাদের ব্যতিব্যস্ত রাখে। আমাদের ভুল রাস্তায় নিয়ে যেতে চায়, আলোর বদলে টেনে নামাতে চায় ঘোর অন্ধকারে। অথচ এসবের চেয়ে জীবন অনেক বেশি মূল্যবান!

এমন কোনো বিষয় কি নেই, যা আপনি প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে অনুভব করেন? আমরা যখন মনোযোগ শব্দটা ব্যবহার করব, তখন আমরা সেই ভাবনা, সেই চিন্তা, সেই লক্ষ্য নিয়েই কথা বলব। যে চিন্তায় আপনার দিনে অন্তত ঘণ্টা পাঁচেক সময় কাটে, অবিরত পরিচর্যায় মিশে থাকে ভালোবাসার অনুভূতি, লুকিয়ে থাকে সম্মান আর গুরুত্বের মর্ম, তা নিয়েই আমরা কথা বলব। অধ্যবসায় দিয়েই আপনি জীবনের ঐ ঘণ্টাগুলোকে ঠেলে অগ্রসর হবেন।

চিন্তার খোরাক

অনবরত পড়তে থাকা বিন্দু বিন্দু পানি কঠিন পাথরের বুকেও এক সময় গর্ত তৈরি করতে সক্ষম।

সময় আপনার কাছে কতটুকু মূল্যবান

সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয়ের তর্কে মজে যাই আমরা, কত সস্তা ভিডিও দেখে অবসর নষ্ট করি। নিজেকেই বরং প্রশ্ন করি, সময়ের কি আদৌ মূল্য আছে আমার কাছে?

আপনার বেশিরভাগ সময় যদি কোনো মহৎ চিন্তাকে কেন্দ্র করে ব্যয় হয়, তাহলে বলা যেতে পারে আপনি সময়কে মূল্যবান ভাবেন। ভবিষ্যতে কাজের ফলাফলেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সময়ের বেশিরভাগটাই ব্যয় হয় অনর্থক কাজে, তাহলে মনে রাখা দরকার, অকারণ সময় নষ্ট করাও এক ধরনের বিলাসিতা।

সালাফগণ, আমাদের উত্তম পূর্বসূরিগণ সময় নিয়ে যত হিসেব করতেন, অর্থকড়ি নিয়েও ততটা হিসেব করতেন না! যে ব্যক্তি তার প্রতিটি মুহূর্ত তুচ্ছ কাজে ব্যয় করে, সে কি জীবনে কখনো বড় কিছু করে দেখাতে পারবে? গোটা প্রজন্ম এমন বিক্ষিপ্ত মানসিকতা লালন করতে পারে না! অনেক সময় সচেতন ব্যক্তিরাও দুনিয়ার সব খবর এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে বেড়াতে থাকে যে, খবর জানা আর জানানোটাই যেন তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া! আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর ওপরই ভরসা করি। নিশ্চয়ই আমরা তাঁর জন্যই এবং তাঁর দিকেই আমরা ফিরে যাব। যে ব্যক্তির থেকে উম্মত ভালো কিছু আশা করে, বড় কোনো ভূমিকা প্রত্যাশা করে; তার মাঝে এমন উদাসীনতা ভর না করুক।

অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সময় নষ্ট করা এই বইয়ের মূলভাষ্য নয়, আমরা কথা বলছি মনোযোগ নিয়ে। বেলা ফুরাবার আগেই সচেতন হওয়া খুব প্রয়োজন। নিজের সময় আর শক্তির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন যাতে আল্লাহর দ্বীনের খিদমত করার মতো সময় হারিয়ে না যায়। যত সময় অপচয় হয়েছে তার জন্য একজন মুসলিম যেন আফসোস করেন, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সত্যনিষ্ঠ মনে ফিরে আসেন। এমন একটা সময় আসবে যখন আফসোস করা, হতাশ হওয়া কিংবা দুঃখ পাওয়ার সুযোগ থাকবে না। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই। ভরসা রাখি তাঁর ওপরই। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সকল শক্তি ও ক্ষমতা কেবল তাঁরই।

চিন্তার খোরাক

'জীবনের একটা মুহূর্ত নষ্ট করার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। এমনকি জিহ্বা যখন পড়া কিংবা আলোচনা থেকে বিরত থাকে, চোখ যখন বই থেকে দূরে থাকে; তখন বিশ্রামরত অবস্থায় চিন্তাকে কাজে লাগাই। যখন আমি আবার উঠি তখন কিছু লেখার আগে সেটা আমার মগজে গেঁথে যায়। আমার খাওয়ার সময় যতটুকু পারি কমাই। এমনকি আমি রুটির বদলে পানি দিয়ে কেক গিলে ফেলি, কারণ কেক চিবানোর প্রয়োজন হয় না। এতে করে আমি আরেকটু বেশি পড়তে পারি, উপকারী কিছু লিখতে পারি।'[১]

মনোযোগ কেন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ

যে আঙুল দিয়ে তাসবিহ, তাহলিল, তাহমিদ গোনার কথা, সে আঙুল ব্যস্ত মোবাইলের টাচ-স্ক্রিনে। জায়েযের সীমারেখায় থাকার আত্মতৃপ্তিতে সন্দেহজনক বিষয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়ের মতো নিয়ামতকে যথেচ্ছ খরচ করছি। এভাবে বহু মানুষের জীবন হয়ে গেছে অনর্থক, মূল্যহীন। কর্মহীনতার অতল গহ্বরে তারা ডুবে যাচ্ছে। সময়, লক্ষ্য আর প্রকল্পে বড় ধরনের অসংলগ্নতা প্রতীয়মান, তাই আমাদের আলোচনা মনোযোগ নিয়েই।

আজকাল অনেক মানুষ এতটাই বিক্ষিপ্ত, অস্থিরতায় ভরপুর জীবনযাপন করে যে, তাদের কাউকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, তার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কী? কোন লক্ষ্য বাস্তবায়নে আত্মত্যাগের প্রয়োজন? কোন কাজের জন্য বেঁচে থাকা জরুরি? অথবা, কোন বিষয়ে সে পারদর্শী হতে চায়? কোন বিষয়টা তার দক্ষতা, সম্ভাবনা আর চিন্তাধারার সাথে মিলে যায়? কোন কাজ করলে সে সমাজ, রাষ্ট্র আর জাতির জন্য কোনো অবদান রাখতে পারবে? এত সব প্রশ্নের কোনো উত্তর আপনি তাদের কাছে পাবেন না। বরং তাদের মাঝে পাবেন অহেতুক আত্মতৃপ্তির আকাশকুসুম অনুভূতি।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতটুকুও বলতে পারবে না, সে দিনে অন্তত আধা ঘণ্টা সময় গঠনমূলক কোনো কাজে ব্যয় করে। দিনে তিন ঘণ্টা কোনো লক্ষ্যকে কেন্দ্র

---

[১] ইবনু আকিল আল-হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহর বাণী।

করে অগ্রসর হওয়া তো তাদের জন্য 'দিল্লি হনুজ দূরাস্ত'—'দিল্লি বহু দূর'! অনর্থক কাজ তার সকল সম্ভাবনাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। অসৎ সঙ্গ, গুরুত্বহীন চিন্তা, সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম ইত্যাদি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। কথার চমকে চমকিত করতে খটাখট টাইপ করে যায় একালের কিবোর্ড-যোদ্ধারা, কখনো সরাসরি আড্ডা দিয়ে, একসাথে হইহুল্লোড় করে দিনের পর দিন সময় নষ্ট করে দ্বীনি সোহবতের অজুহাতে। দিনশেষে সে যখন বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, তখন হয়তো কেউ কেউ বোঝে, কী ভীষণ ক্ষতির মাঝে তার জীবন কেটে যাচ্ছে! সে আফসোস করে হারানো সময়ের জন্য। বুকভরা অনুতাপ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর সকাল এলে সে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়।

মনোযোগ নিয়ে কথা বলছি, যাতে করে এই কম্পাসের মাধ্যমে উদ্‌ভ্রান্ত জনতাকে ঠিক পথটি দেখানো যায়, তাদেরকে 'উত্তর-দক্ষিণ' চেনানো যায়। একাগ্রতার আলো যেন তাদের জীবনের জমাটবাঁধা ঘোর অমানিশাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। একনিষ্ঠতাই তাদেরকে ফিরিয়ে আনবে সম্ভাবনা আর উচ্চাশার আঙিনায়। তেমনিভাবে যারা কোনো লক্ষ্য, উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে জীবনের গল্প রচনা করে চলে, তাদের জন্যও এ এক বার্তা। এর মাধ্যমে তাদের চিন্তা কিংবা প্রকল্পে অভাবনীয় প্রভাব পড়তে পারে। তাদের প্রত্যেকের দরকার মনোযোগের মহৌষধ, যাতে তারা নিজেদের মাঝে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে।

অনেকের ধারণা চিন্তা আর উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা থাকলেই একনিষ্ঠতা অর্জিত হবে। মূলত এটা অসম্ভব। এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের চিন্তা স্পষ্ট, পরিকল্পনা নির্ধারিত, কাজের ক্ষেত্র জানা। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা বিশেষ কিছু করতে পারেননি। কারণ পথ চেনা কিংবা দিক জানা থাকাটাই সবটা নয়। মনোযোগ ধরে রাখতে না পারলে কিছুই অর্জন করা সম্ভব না, যত চেষ্টাই করা হোক না কেন।

মূলত একাগ্রতা সম্পর্কে বলার উদ্দেশ্য হলো লোকজনকে অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো। যে উপকারী চিন্তা আর লক্ষ্যের জন্য মানুষ বাঁচে, যে বার্তাকে উপজীব্য করে জীবনের খেয়াঘাটে আগমন ঘটে পণ্যবোঝাই জাহাজের; তার খোঁজের জন্য মানচিত্র এঁকে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রজন্মকে কাজের আধিক্য, দায়িত্বের ভিড় আর ছকে-বাঁধা-জীবন থেকে বেরিয়ে এসে এমন কিছু করার এক আহ্বান যা ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে।

একই সাথে এই আহ্বান অভিনব কিছু করার। কারণ অভিনবত্ব মূলত মনোযোগেরই শাখা। যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে, তার চেষ্টা এত বেশি আর ঐকান্তিক হয় যে, সে সবসময় ঐ পরিকল্পনা আর চিন্তার মাঝেই ডুবে থাকে। তার সময় কেটে যায় জীবন স্বপ্নের আঙিনায়। যখনই সে নিজের কাজ নিয়ে চিন্তা করে, তখন এক প্রকার আনন্দের অনুভূতি ছেঁয়ে যায় তার সমগ্র সত্তায়। সুতরাং, এ আহ্বান এমন এক ক্ষেত্রে সংগ্রামের আহ্বান, যে ক্ষেত্রটা বিনা যুদ্ধে, বিনা পরীক্ষায় অর্জনযোগ্য নয়।

চিন্তার খোরাক

দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমিতে দিক হারিয়েছেন। মরীচিকার ভ্রমে ছুটে মরছেন এক ঢোক পানির আশায়। জলাশয় ভেবে যেদিকে ছুটে যাচ্ছেন আপনি, সেখানে কেবলই শুকনো উত্তপ্ত বালু আর তেজোদীপ্ত সূর্য!

এটাই আমাদের বেশিরভাগের জীবনচিত্র। জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে কোন দিকে যে এগিয়ে চলেছি, নিজেরাও জানি না। কখনো মহাসমুদ্রে বাতিঘর খুঁজতে থাকা নাবিক, কখনো মরুপ্রান্তরে মরীচিকার ভ্রান্তিতে ছুটে চলা অস্থির প্রাণ—এটাই আমাদের বর্তমান প্রতিচ্ছবি!

বার্তা

ইমাম ইবনু হাজার সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফাতহুল বারি* রচনা করেন ২৫ বছর ধরে। তারপর ইয়েমেনের আলিম শাওকানি তার ব্যাপারে বিখ্যাত বাণী দিলেন, 'ফাতহের (ফাতহুল বারির) পর কোনো হিজরত নেই।'

মনোযোগের নিগূঢ় তত্ত্ব

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, 'মনোযোগ' বলতে আসলে কী বোঝায়?

আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য হোক আর বইয়ের শুরুতে শব্দটার ব্যবচ্ছেদের জন্য হোক, পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা দরকার।

মনোযোগের অর্থ হলো কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে আপনার হৃদয়াবেগ, অনুভূতির মতিগতি আর সময় ব্যয় করতে থাকা, যতক্ষণ না আপনি গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন।

একাগ্রতা মানে হলো একটা বিষয় সারাদিন আপনার ভাবনাজুড়ে থাকবে। সকাল থেকে সেটার পেছনে ছুটতে শুরু করবেন, সমস্ত দিন তাকেই তাড়া করে বেড়াবেন, সন্ধ্যাবেলাতেও আপনার মন ও মননে সেই বিষয়টাই থাকবে।

একনিষ্ঠতা হচ্ছে সারাদিনে আপনার লক্ষ্যকে ততক্ষণ ছেড়ে যাবেন না, যতক্ষণ আপনি পুরোপুরি তৃপ্ত না হচ্ছেন, শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে না পড়ছে।

মনোযোগের অর্থ হলো, সারাক্ষণ আপনার মাথায় থাকবে আপনি কোথায় যাচ্ছেন। আপনি যখন কর্মক্ষেত্রে যাবেন, তখন আপনার মনে কেবল সেই লক্ষ্য আর দায়িত্ববোধ কাজ করবে। দিবা-দ্বিপ্রহর আসার আগেই আপনি সে কাজের বড় একটি অংশ শেষ করে ফেলবেন।

এ বিষয়ে এক জার্মান প্রাচ্যবিদ ও মাহমুদ আত-ত্বানাহির মধ্যকার একটি গল্প বলা যাক। একদিন তারা প্রাচীন নথিপত্র নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত হঠাৎ কবিতার এই পঙ্‌ক্তিটি তাদের চোখে পড়ল—

ملك منشد القريض لديه... يضع الثوب فى يدى بزاز

প্রাচ্যবিদ ত্বানাহিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই পঙ্‌ক্তিটা কোন প্রকার 'বাহ্‌র' (ছন্দ)-এর?'

ত্বানাহি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রাখলেন। তারপর একটা লজ্জামাখা হাসি দিয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। প্রাচ্যবিদ বিস্ময়ের সাথে বললেন, 'আযহারের দারুল উলুম থেকে পাশ করা একজন ছাত্র ছন্দশাস্ত্র জানে না, এ কেমন কথা!'

ত্বানাহি বলেন, সেদিন আমি যখন বসা থেকে উঠি, তখন আমার মাথায় দুশ্চিন্তার ঝড় বইতে শুরু করেছে। প্রাচ্যবিদের কথা আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আমি বাড়ি ফিরে সরাসরি লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়ি। শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ শারাকি রচিত *আল-মুযাক্কিরাতুল ওয়াফিয়া ফি ইলমাইল আরুদ ওয়াল ক্বাফিয়া* বইটি বের করে নিলাম। এই বই আযহারে পাঠ্য ছিল। বইটিতে আমি পুরোপুরি ডুবে গেলাম। সকাল-বিকাল এভাবে কেটে যেতে লাগল। অবশেষে একদিন আমার জন্য কবিতার ছন্দ একদম পানির মতো সহজ হয়ে গেল, যাকে বলে একেবারে জলবৎ তরলং। আমি নতুন করে সেগুলো আবার শিখলাম।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এরই নাম মনোযোগ, যা নিয়ে আমরা কথা বলছি।

চিন্তার খোরাক

যদি জ্ঞানের কোনো শাখায় সফলতা অর্জন আপনার জন্য কষ্টসাধ্য হয়, তাহলে আপনার জন্য দুটো পরামর্শ—

এক. নিজেকে সাহস জোগান এই বলে, আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। আল্লাহ আপনাকে পর্যাপ্ত মেধা আর জ্ঞান দিয়েই এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

দুই. কাজটিতে আপনার মনপ্রাণ ঢেলে দিন, সময় ব্যয় করুন এবং সমস্ত অনুভূতি একীভূত করুন। আপনি লিখে রাখুন, আল্লাহ তাআলা চাইলে একদিন আপনি সেই বিষয়ে একজন অগ্রদূতে পরিণত হবেন।

শিক্ষণীয় ঘটনা

১৯৬৩ সালে পড়াশোনার জন্য আমি আমেরিকায় যাই। নিজের জ্ঞানের অবস্থা নিয়ে আমার মাঝে বেশ ভয় কাজ করছিল। একজন মিশরীয় ছাত্র হয়ে আমি ইংরেজি সাহিত্যে বিশ্বের সেরা কয়েকজন অধ্যাপকের কাছে পড়ব। সেখানে আমি ছাড়া অন্য কোনো আরব ছাত্রও নেই। আমাকে পাঠ্যবইয়ের বিশাল একটি তালিকা ধরিয়ে দেওয়া হলো। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটা হোটেলে রুম ভাড়া নিয়েছিলাম। সেখানে রাতদিন পড়াশোনায় ডুবে রইলাম। ইংরেজি সাহিত্যের যত রোমান্টিক কবি (আমার গবেষণার বিষয়) আছে সবার কবিতাসমগ্র পড়ে ফেললাম। তাদের সম্পর্কে লেখা অনেক সমালোচনা গ্রন্থ পড়তে লাগলাম। কিছু আধুনিক নাটক পড়লাম। মিল্টনের বইগুলোও শেষ করলাম। এভাবে প্রাথমিক পর্যায় পার করে সমালোচনার মানসিকতা তৈরি হলো আমার মধ্যে। মনে হচ্ছিল, আমি আমার সহপাঠী কিংবা শিক্ষকদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করার মতো যোগ্যতা অর্জন করেছি। পরে জানতে পারলাম, আমিই নাকি একমাত্র ছাত্র যে এভাবে পড়েছে। আমার কথা চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, আমার সহপাঠীরা আমার কাছে পড়তে আসত।[১]

---

[১] মাসিরির আত্মজীবনী গ্রন্থ *রিহালাতি আল-ফিকরিয়্যা* থেকে নেওয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাজের মাঝে কীভাবে মনপ্রাণ ঢেলে দেবেন

আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই

আলোচনা শুরুর আগে সবচেয়ে দামি আর গভীর একটি প্রশ্নের উত্তর বের করা দরকার। প্রশ্নটি হলো, 'আমি কে?'

এ প্রশ্নটি আপনাকে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। প্রথমেই আপনাকে পথের শুরু আর শেষ দেখিয়ে দেবে। প্রথমে নিজেকে প্রশ্ন করুন, 'আমি কে?' 'আমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?' 'কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি আমি?'

এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করা, অভিনব কিছু করা, ইতিহাসের পাতায় এমন কিছু রেখে যাওয়া যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, হয়তো সেই অভিনব কাজ সাদাকায় জারিয়াহ হয়ে আখিরাতের জীবনকে সহজ করবে।

যদি ব্যক্তির মনে উচ্চাশা থাকে, তাহলে তা অর্জন করতে শরীর আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। সেজন্যই এ প্রশ্নগুলো আসছে। আপনি যেন চিন্তার জগতে ঘুরে বেড়াতে পারেন, জীবনের আঙিনায় আনতে পারেন বসন্ত-কিশলয়ের নতুনত্ব—এ তারই প্রয়াস মাত্র।

নিজেকে চিনুন। আপনার শরীর-মন কি বিশাল কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে এগুতে চায়? আমরা বড় কিছু করার কথা বলছি, যা করতে প্রয়োজন দৃঢ় মানসিকতা।

একাগ্রতার অভ্যাসটা সব ধরনের মানুষের সাথে আলোচনা করার মতো বিষয় না। এটা কেবল তাদের জন্য, যারা জীবনকে ঢেলে সাজাতে চায়। যারা হতাশার খাদ থেকে প্রত্যাশার পাহাড়ে উঠতে চায়। যারা জীবনে চলার পথে নানা প্রকারের বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।

তুলতুলে নরম বিছানা ছেড়ে এখনই উঠে পড়ুন। ঝেড়ে ফেলুন সব রকম আলস্য। এমন ইতিহাস রচনা করুন, যা থেকে যুগ যুগ ধরে বিশ্ববাসী তার মনের রসদ জোগাতে পারবে।

আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, এই ঘরের প্রবেশপথে প্রচণ্ড ভিড়। জীবন থেকে মনোযোগ হারিয়ে যাওয়ার অর্থ, আপনি সেই ভিড়ে আটকা পড়ে যাবেন। যে আঁধারে আটকে ছিলেন, সে আঁধারেই আজীবন পচে মরতে হবে। আপনার মতো লোকের জন্য এমন প্রান্তিক জীবনযাপন করা কিংবা প্রবেশপথের ভিড়ে থেমে থাকা মানায় না। জীবনে এ অভ্যাসটা কাজে লাগাতে যেসব পথ ও পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেগুলোর জন্য স্বপ্নবাজ হতে হবে, কর্মতৎপর ব্যক্তিদের মতো স্বপ্ন দেখতে হবে।

চিন্তার খোরাক

হলরুমে প্রবেশের জন্য লোকে লোকারণ্য। অথচ আপনি ভিড়ে থেমে থাকার মতো লোক নন!

আলোকপাত

আপনি যদি ইবনু কুদামার *আল-মুগনি*, ইবনু আব্দিল বারের *আত-তামহিদ*, ইবনু হাজারের *ফাতহুল বারি*, ইবনু আশুরের *আত-তাহরির ওয়াত-তানওয়ির*, আলবানির *সহিহুস সুন্নাহ* ও *যয়িফুস সুন্নাহ*-র মতো বইগুলো ভালো করে দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন—এগুলো ১ দিন কিংবা ১ মাস কিংবা ১ বছরে আসেনি। বরং এগুলো মনোযোগ আর দীর্ঘসময় ধৈর্য ধরে লেখার ফল। ধীরে ধীরে এগুলো বড় হয়েছে। অবশেষে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এর চূড়ান্ত রূপ থেকে উপকৃত হচ্ছে।

ক্রস চিহ্নের সন্ধানে

একবার এক পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বড় ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলো। এতে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সামগ্রিক কার্যক্রম মন্থর হয়ে পড়ল। প্রকৌশলীরা অক্লান্ত চেষ্টা করার পরেও সমস্যা নির্ণয় কিংবা সেটার সমাধান করতে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য চাইলেন।

যথাসময়ে সাদা এপ্রোন পরা সেই বিশেষজ্ঞ হাজির। একটি কাগজ হাতে নিয়ে টানা দুই দিন কেন্দ্রের বিভিন্ন অংশ চষে বেড়ালেন তিনি। কন্ট্রোল ইউনিটের বিভিন্ন অংশ যাচাই করে দেখলেন। কাগজে মন্তব্য টুকে রাখলেন, গাণিতিক হিসাব করলেন। দ্বিতীয় দিন শেষে তিনি একটি কালো মার্কার বের করে একটা যন্ত্রের ওপর বড় করে ক্রস চিহ্ন দিলেন। আর বললেন, 'সমস্যাটা এখানে। এই যন্ত্রটা ঠিক করতে হবে নয়তো পাল্টাতে হবে। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তারপর সাদা এপ্রোনটা খুলে তিনি গাড়িতে করে বিমানবন্দরে গেলেন। সেখান থেকে ফিরলেন নিজের দেশে। এদিকে প্রকৌশলীরা সেই যন্ত্রটার বিভিন্ন অংশ খুলে দেখেন আসলেই সমস্যাটা সেখানে। সেটা ঠিক করা হলো। পারমাণবিক কেন্দ্রে এরপর আগের মতো পুরোদমে কাজ চলতে থাকে।

এক সপ্তাহ পর সেই পারমাণবিক কেন্দ্রের পরিচালকের কাছে একটি বিল আসে। বিলের ওপর চোখ বুলিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, বিশেষজ্ঞ লোকটি তার কাজের বিনিময়ে ১০ হাজার ডলার দাবি করছেন। মাত্র দুদিনের কাজের বিনিময়ে এমন মোটা অঙ্কের দাবি দেখে পরিচালক তো রীতিমতো আকাশ থেকে পড়লেন! তিনি সেই বিশেষজ্ঞের কাছে চিঠি পাঠালেন—

'আপনার বিলটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। অর্থের পরিমাণটা কি আরো কমানো যায় না? আপনি তো কেবল একটা যন্ত্রে ক্রস চিহ্ন দিয়েছেন। মাত্র দুদিনের সামান্য কিছু কাজ করে ১০ হাজার ডলার দাবি করা তো অনেক বিশাল ব্যাপার!'

কিছুদিন পর একটি ফিরতি চিঠি পেলেন পরিচালক সাহেব। তাতে লেখা ছিল—

যন্ত্রের ওপর যে ক্রস চিহ্নটা দিয়েছি তার বিল এক ডলার। কিন্তু কোন যন্ত্রের ওপর

ক্রস চিহ্ন দিতে হবে তা দেখানোর বিল ৯,৯৯৯ ডলার।[১]

চিন্তার খোরাক

আপনি নিজেই নিজের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করতে পারেন।

.....

বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে অবগত, যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।[২]

.....

সতর্কবাণী

আপনি যদি সমস্যার জায়গাটা খুঁজে বের করে কেটে ফেলতে না পারেন, তাহলে আপনার আগ্রহ, দক্ষতা আর পারদর্শিতাকে চিহ্নিত করুন।

তা না হলে ভবিষ্যতে সফলতার পথ দীর্ঘায়িত হবে!

কোথায় আপনি ক্রস দেবেন?

ওপরের ঘটনা থেকে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট—সফল হতে হলে, সমস্যা সমাধান করতে হলে আগে মূল বিচ্যুতিটা খুঁজে বের করতে হবে। নয়তো অক্লান্ত শ্রম, অমূল্য চিন্তা আর অঢেল অর্থই কেবল ব্যয় হবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না।

অনেক সময় আমাদের কাজে ছিদ্র বা ফাটল থেকে যায়। আমাদের শ্রম, শক্তি আর ক্ষমতার একটি বিরাট অংশ সেই ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়, নষ্ট হয় আমাদের ভেতরকার অমিত সম্ভাবনা। সেসব ফাটল আমরা যখন খুঁজে পাই ততক্ষণে হয়তো সুযোগ হাতছাড়া ।

রোগ নিরাময় করতে হলে আগে রোগ নির্ণয় জরুরি। সফল হতে হলে কাজে লাগাতে হয় নিজের শক্তিকে। তাই ঠিকভাবে ক্রসচিহ্ন দিতে পারা অত্যাবশ্যকীয়। আমাদের সেই জায়গায় ক্রসচিহ্ন আঁকতে হবে, যা আমাদের শক্তি আর সম্ভাবনাকে

---

[1] *Focal Point*, Brian Tracy

[২] সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ১৪-১৫

ক্রমাগত দুর্বল করে তোলে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এমন কিছু আছে যার জন্য আমরা অন্যদের থেকে আলাদা। নিজেদের সেই শক্তি আর দক্ষতাকে খুঁজে বের করুন। কেননা এই বৈশিষ্ট্যগুলোই ভবিষ্যতে আপনাকে স্বতন্ত্র স্থানে পৌঁছে দেবে, অনন্য করে তুলবে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, 'কোন কোন সমস্যা বা ভুলের জন্য ক্রস দিতে হবে?'

সমস্যার তো শেষ নেই। যেমন : সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম। অন্যের জীবনের টুকিটাকি খবর জানতে গিয়ে নিজের জীবনের অমূল্য সময়কে পায়ে ঠেলে দিচ্ছি আমরা। সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে না পারা আরেকটি কারণ। হতে পারে অতিরিক্ত ঘুম, আড্ডাবাজির মতো কিছু বদভ্যাস আপনার সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

আরেকটা প্রশ্ন হলো, কোন কোন পারদর্শিতাকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন? কোন দক্ষতাকে চিহ্নিত করলে তা সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করবে, ভবিষ্যতে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানের কারণ হবে?

কেবল নিজের সম্ভাবনার ক্ষেত্র নির্ধারণ করতে পারাই আপনার সাথে অন্যদের বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। এই একটি কাজই আপনার মর্যাদাকে উন্নীত করতে সক্ষম, সফলতার মুকুট পরাতে পারঙ্গম।

এক মুহূর্ত থেমে নিজের দক্ষতার জায়গাগুলো যাচাই করে দেখুন। এগুলো কি আপনার জীবনের উদ্দেশ্যের সীমারেখার মধ্যেই আছে নাকি পুরোপুরি আওতার বাইরে চলে গেছে?

সফলতার জন্য আমরা যেমন সমস্যা ও সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করি, একই সাথে পর্যবেক্ষণ করা উচিত আমাদের বৈবাহিক জীবন, কর্মজীবন, স্বাস্থ্য ও অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলোকে। এভাবে জীবনের এমন প্রতিটা বিষয়কে আমরা চিহ্নিত করতে পারি যেগুলো ভবিষ্যতে আমাদের অর্জন আর সফলতাকে প্রভাবিত করবে।

চিন্তার খোরাক

কল্পনার রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসুন। সকল দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলুন। আত্মসমালোচনায় দৃঢ় হোন। জীবন একটাই, বারবার আসবে না!

ঝেড়ে ফেলুন সব অস্থিরতা

আপনার মনোযোগ স্থাপনে প্রধান বাধা হচ্ছে অস্থিরতা আর বিক্ষিপ্ততা। আপনার যদি নিজের ওপর আস্থা থাকে, আল্লাহর দেওয়া দক্ষতা ও প্রতিভার গুরুত্ব বুঝতে পারেন, মনোযোগ বাড়াতে চান তাহলে সবার আগে এই বাধাকে দূর করতে হবে।

আমরা একেবারেই প্রান্তিক এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে ডুবে থাকি। এমন সব বিষয় নিয়ে রাতদিন ব্যস্ত থাকি যার সাথে সংস্কার, গঠন বা পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র সম্পর্কও নেই। একে বলা চলে ব্যাপক বিক্ষিপ্ততা। দুঃখজনক হলেও সত্যি, এটা এখন প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিক্ষিপ্ত জনতার কাছ থেকে কীই বা আশা করা যায়?

মোবাইল ফোন, বিশেষ করে ফেসবুক এবং মেসেঞ্জার আমাদের সীমাহীন ক্ষতি করছে। অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের কথা বাদ দিলেও এ দুটোর ক্ষতিকর প্রভাব এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এসব আমাদের অনুভূতিকে ভোঁতা করে আমাদেরকে ব্যক্তিত্বহীন মানুষে পরিণত করছে, ঠেলে দিচ্ছে বিষণ্নতার দিকে। ফলে আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর বিরক্ত হয়ে পড়ছি। সেই বিরক্তির জায়গাটা এমন কিছু দিয়ে পূরণ করতেও পারছি না, যা সত্যি সত্যিই আমাদের জীবনে আনন্দ বয়ে আনবে।

যে লোকটি মোবাইলের পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করে, তার কাছ থেকে কি আদৌ কল্যাণকর কিছু আশা করা যায়? চারদিকে এত এত সমস্যা, রক্তপাত, দুর্দশা আর দুর্নীতির গল্প কেবল আমাদের অস্থিরতাই বাড়িয়ে দেয়, চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে। আমাদের মন-প্রাণ আর সময়ের বারাকাহ নষ্ট করে দেয়।

আমরা যদি মনোযোগ দিতেই চাই, তাহলে দীর্ঘসময়ের জন্য হাত থেকে মোবাইল সরিয়ে ফেলার অভ্যাস করতে হবে। এটাই মনোযোগী হবার দ্বিতীয় ধাপ। মোবাইলের আকর্ষণ উপেক্ষা করা না গেলে, কাজে মনোযোগ পাওয়া দুষ্কর। আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হচ্ছে সময়। আর সেটাই কেড়ে নিচ্ছে এই মুঠোফোন।

সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম যে কেবল আমাদের সময় কেড়ে নিচ্ছে তা নয়, বরং আমাদের চিন্তা ও মননে, কাজে ও কর্মে প্রতিনিয়ত অস্থিরতা তৈরি করছে। সারা

বিশ্বের খবরাবর জানা দোষের কিছু নয়। কিন্তু যেকোনো চলমান ঘটনা জানার জন্য আমরা এত বেশি সময় ব্যয় করি, যা আমাদের অকল্যাণ ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনে না। কখনো কি নিজেকে প্রশ্ন করেছি, এত এত খারাপ খবরের ভিড়ে আমরা শান্ত থাকব কী করে? এমন দুঃসহ বাস্তবতার মুখে কতটুকুই আর আত্মোন্নয়ন আশা করতে পারি?

আপনি যদি এটা মনে করেন, মোবাইল ফোনের সাথে আপনার বিচ্ছেদ সম্ভব নয়, তাহলে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছানো বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আপনি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চাচ্ছেন, অথচ সবচেয়ে ক্ষতিকারক বস্তুটি থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছেন না। প্রশ্ন করুন নিজেকে, 'লোহার বেড়ি পায়ে জড়িয়ে আমি কি খুব সহজে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব?'

সেক্ষেত্রে আপনার পথ দীর্ঘায়িত হবে। আপনার চাওয়া-পাওয়ার মাঝে অনেক বাধা আসবে। অথচ এই অনাকাঙ্ক্ষিত বাধা দূর করে নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করার সম্ভাবনা ছিল।

আমি যা বললাম তা মানতে যেহেতু আপনি রাজি নন, তাহলে বিকল্প রাস্তায় আপনাকে হাঁটতে হবে। যদি মোবাইল ফোনের এই আসক্তি পুরোপুরি ছাড়তে না পারেন, তাহলে একে সীমিত করে ফেলুন। নিজের লক্ষ্য অর্জনে একটা চ্যালেঞ্জ ঠিক করুন। প্রতিদিন এক ঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে কাজ করার পর বিশ্রাম হিসেবে ১০ মিনিট করে মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন। ছোট্ট এই বিশ্রাম আপনার শক্তি ফিরিয়ে দেবে। এরপর আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করতে পারেন।

চিন্তার খোরাক

যদি আপনি মোবাইলে ব্যয় করা সময় থেকে প্রতিদিন এক ঘণ্টা আর সপ্তাহে একদিন বাঁচাতে পারেন তাহলে বোঝা যাবে, ভবিষ্যৎ গঠনে এবং লক্ষ্য পূরণে আপনার সত্যিকারের ইচ্ছা আছে।

জীবনে আপনি কী হতে চান

মনোযোগের অভ্যাস গড়ে তোলার পরবর্তী ধাপ হলো পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এই ধাপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; যেন নিজেকে নির্দিষ্ট কাজে ধরে রাখা যায়।

সকালে দিনের শুরুতেই চিন্তার বেশিরভাগজুড়ে সেই লক্ষ্য থাকবে। আবার রাতে যখন ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরবেন তখনও যেন সেই চিন্তা আপনার মাথায় ঘুরপাক খায়।

প্রতিভা নষ্ট হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ বিক্ষিপ্ততা। আমরা আসলে কী চাই সেটাই জানি না। আমাদের মাঝে অনেকেই আছে, যারা একই সাথে অনেকগুলো কাজে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ছাড়াই স্রোতের সাথে ভেসে চলেছি। রাফ খাতায় যেমন সব কিছুই জায়গা পায়, আমাদের অবস্থাও তেমন। হয়তো আমার বন্ধু কোনো প্রকল্পে যোগ দিচ্ছে তা দেখে আমিও কোনো চিন্তাভাবনা না করে অংশ নিলাম, অথচ সব ভালো কাজ সবার জন্য নয়। প্রতিটি মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষত্ব থাকে, সবার একই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতেই হবে এমন তো নয়। যেকোনো কাজ শুরুর আগে কেন কাজটি করছি জানতে হবে, আসলেও কাজটা আমার জন্য কি না, কাজে জড়াব কি না—সেই সিদ্ধান্ত নিতে জ্ঞানীদের পরামর্শ নেব এবং ইস্তিখারার সালাত আদায় করব। সাহাবিরা যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ইস্তিখারা পড়তেন। কিন্তু হুজুগে কাজ করতে থাকলে ভবিষ্যতেও ভালো কিছু করা সম্ভব না।

নিজেকে মাত্র কয়েক মিনিট সময় দিন। সফল মানুষদের নিয়ে ভাবুন, যারা ইতিহাসে পদচিহ্ন রেখে গেছে, সভ্যতা গড়েছে, যারা কর্মের জন্য মুসলিম জাতির কাছে চিরস্মরণীয়। এমন স্মরণীয় ব্যক্তিরা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছে, সে কারণেই ইতিহাসে তাদের নাম লেখা আছে সোনালি হরফে। কিন্তু আপনি এমন একজন মানুষেরও উদাহরণ দিতে পারবেন না, যে ব্যক্তিটি কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বড় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে!

প্রত্যেক বড় মানুষ, যারাই জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছু করেছে; তারা একটা স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে সামনে এগিয়েছে। সেই লক্ষ্যের প্রতি তাদের ছিল সীমাহীন আগ্রহ। সেখানে সবটুকু মনোযোগ ঢেলে দিয়ে তবেই তারা ইতিহাস গড়তে সক্ষম হয়েছিল। আমি নিশ্চিতভাবেই বলছি, 'আপনার যদি নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য না থাকে, জীবনের কোনো পরিকল্পনা না থাকে; তাহলে হাজার হাজার বই পড়ে, শত শত কোর্স করেও বিশেষ কিছু লাভ হবে না। তাই একটু থেমে ক্ষণিকের জন্য হলেও নিজেকে নিয়ে ভাবুন।

আপনি যেসব বই পড়ছেন, যেসব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছেন, যে সমস্ত কোর্সে অংশ নিচ্ছেন, সেগুলো আপনাকে হয়তো কর্মক্ষেত্রে কিছুটা সহায়তা করবে; কিন্তু জীবনের স্বপ্ন পূরণে সুদূর প্রসারী কিছু করে দিতে পারবে না।

আপনি যদি সেই পাহাড়ে উঠতে চান যার চূড়া থেকে নিজের অবস্থান দেখতে পাবেন, যদি সেই বসন্তে পৌঁছতে চান যাতে নিজের স্বপ্ন দেখার মুহূর্তগুলো বর্ণনা করতে পারবেন; তাহলে নির্দিষ্ট একটি চিন্তা, লক্ষ্য বা স্বপ্নের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। যতক্ষণ আপনার উদ্দেশ্য পূরণ না হয়, বিশ্ববাসীকে সফলতার দিকে আহ্বান করতে না পারেন; ততদিন পর্যন্ত লেগে থাকুন। ঠিক এ বিষয়টি বোঝাতে আমি *জীবনের পরিকল্পনা* বইটি লিখেছি। আশা করা যায়, সেটা পড়ে জীবনকে উপলব্ধি করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না।

চিন্তার খোরাক

দুজন মানুষের কথা কল্পনা করুন। এদের মাঝে একজন প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কেবল একটি কাজই করে। অন্যজন অনেকগুলো কাজ আর পরিকল্পনা নিয়ে একসাথে অগ্রসর হচ্ছে।

আপনি কি এদের মধ্যকার তফাত বুঝতে পারছেন? এদের মাঝে কে আগে গন্তব্যে পৌঁছবে? কে জীবনের কঠিন পরিখাগুলো সূক্ষ্মভাবে পার হয়ে সফলতার শীর্ষে পৌঁছাবে? উত্তরটা সহজ, কিন্তু কেবল একটি কাজে মনোসংযোগ স্থাপন করা বেশ কঠিনই বটে।

লক্ষ্যের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ

ইহুদিদের নিয়ে আমি একটা এনসাইক্লোপিডিয়া লিখছিলাম। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের সময় আমার লেখা সব কাগজপত্র কুয়েতে রয়ে গিয়েছিল। আমার এতদিনের পরিশ্রমের ফসল হাতছাড়া হয়ে যাবে আর আমি কায়রোতে বসে থাকব—এটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কুয়েতে যাব। হয় আমার এনসাইক্লোপিডিয়ার কাগজপত্রের সাথেই থেকে যাব, নয়তো সেগুলো কায়রোতে নিয়ে আসব। সেই যাত্রায় আমার স্ত্রীকে আমি 'বিধবা' বলেই পরিচয় দিচ্ছিলাম। যা-ই হোক, আমরা কুয়েতে গেলাম। তিন সপ্তাহের মতো থাকলাম সেখানে। পুরোটা সময় এনসাইক্লোপিডিয়ার কাজে ডুবে ছিলাম।

কাজ শেষে বন্ধুবান্ধবের সাথে পরামর্শ করে একটা বড় ট্রলি ভাড়া করলাম। সেখানে আমার সব কাগজপত্র (প্রায় ত্রিশ কার্টন) রেখে দিলাম। বন্ধুরা গাড়িতে উঠল। কাগজপত্র নিতে পারছি এ আনন্দে আমি গাড়িতে ওঠার কথা পর্যন্ত ভুলে গেলাম। প্রথমে আমরা বাগদাদে গেলাম। তারপর পর্যায়ক্রমে রাশিদ, আকাবা, নুয়াইব, মিশর হয়ে কায়রোতে পৌঁছলাম। গাড়ি খালি করে আবার এনসাইক্লোপিডিয়ার কাজে লেগে পড়লাম।[১]

লিখিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া লিখিয়ো না

আপনি যদি আপনার পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে পারেন, আপনার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে বের করতে সফল হন, আপনার সক্ষমতা আর সম্ভাবনার সাথে খাপ খায় এমন কাজের সন্ধান পেয়ে যান; তাহলে আপনি ইতোমধ্যেই এই অভ্যাসের ভিত্তি স্থাপন করে ফেলেছেন। এবার এর ওপর আপনার স্বপ্নের নান্দনিক ইমারত গড়ে তুলুন, আশার মিনার তৈরি করুন। লিখতে শুরু করে দিন জীবনের গল্প। জীবনের বৃহত্তম মর্যাদার অধ্যায় রচনা করুন।

আপনার পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা লিখে ফেলুন। আগামী পাঁচ বছর পর আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান?

আপনার জীবনে কোনো পরিকল্পনা থাকা এক কথা, আর এর জন্য রূপরেখা প্রণয়ন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কেবল পরিকল্পনা থাকলেই একজন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। বরং একজন মানুষের এমন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন যার মাধ্যমে পথের শেষটা দেখতে পাবে, যা তাকে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেই স্বপ্নের পানে ছুটে চলতে সহায়তা করবে।

এমন অনেকে আছে যাদের মনে স্বপ্ন আছে। সে স্বপ্ন পানে ছুটে চলতে গিয়ে তারা পুলকিত হয়। কিন্তু তারা জানে না, কী করে সেই স্বপ্ন পূরণ করবে, কীভাবে সে গন্তব্যে পৌঁছবে। তাদের স্বপ্নের পথ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। দিনশেষে এরা সুখকর কিছু খুঁজে পায় না। তাদের কিছু অর্জন অবশ্য হয়, তবে রূপরেখা না থাকায় দুর্বলতা থেকেই যায়। এজন্য প্রথমেই রূপরেখা তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। তারপর সেটার

---

[১] মাসিরির আত্মজীবনী গ্রন্থ *রিহালাতি আল-ফিকরিয়্যা* থেকে নেওয়া।

আলোকে প্রতিটি দিন, সপ্তাহ, মাস কিংবা বছর অগ্রসর হওয়া যাবে। এই রূপরেখাই আপনাকে বিক্ষিপ্ততা থেকে রক্ষা করে স্বপ্নপূরণে মনোযোগী করে তুলবে। তাই পরবর্তী পাঁচটা বছরের জন্য আপনার রূপরেখা রচনা করে ফেলুন।

আমার পরিকল্পনা : .....

পরিকল্পনা যেভাবে বাস্তবায়ন করব : .....

.....

.....

.....

উদাহরণ হিসেবে নিচের রূপরেখাগুলো দেখতে পারেন :

যিনি জ্ঞানার্জনের পদক্ষেপ নিয়েছেন, তিনি আগামী ১০ বছরের জন্য নিজের রূপরেখা প্রণয়ন করতে পারেন। তার মধ্যে ৫ বছর শারয়ি জ্ঞানের প্রতিটি মৌলিক ক্ষেত্র (আকিদা, তাফসির, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ) আর সহায়ক ক্ষেত্রের (নাহু[১], উসুল[২], কাওয়ায়িদুল ফিকহ[৩], কাওয়িদুত তাফসির[৪], মুস্তালাহ[৫]) মৌলিক জ্ঞান অর্জন করবেন। প্রধান লক্ষ্য হবে ৫ বছরের মধ্যে এই সব বিষয়ে মূল জ্ঞানটুকু আত্মস্থ করা। শেষ হলে পরের ৫ বছর এই বিষয়গুলোর মাঝে যেকোনো একটি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনে সময় দেবে। এভাবে নিজের বিশেষত্বের ক্ষেত্রে সে অভিনব কিছু করার জন্য নিজেকে উপযোগী করে তুলবে।

যিনি সাংবাদিকতা সেক্টরে পরিকল্পনা নিয়েছেন, তার আগামী পাঁচ বছরের একটা পরিকল্পনা থাকবে। সেই পরিকল্পনায় তিনি শারয়ি কিছু মৌলিক জ্ঞান অর্জন করার বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত করবেন যাতে ভবিষ্যতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পদস্খলন না ঘটে। আর সাংবাদিকতা সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করে নেবেন। এরপর একটি নির্দিষ্ট

---

[১] আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র

[২] ইসলামি আইনের মূলনীতি

[৩] ফিকহশাস্ত্রে মূলনীতি

[৪] তাফসিরশাস্ত্রের নীতিমালা

[৫] হাদিস ও ফিকহের মৌলিক পরিভাষা সমগ্র

শাখায় বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করবেন। সেটা হতে পারে প্রেজেন্টেশন, ডিজাইনিং, ফটোগ্রাফি কিংবা অন্য কিছু। এভাবে তিনি সফলতার দিকে এগিয়ে যাবেন।

যারা চিকিৎসা, সমাজ, শিল্প কিংবা শিক্ষাখাতে পরিকল্পনা নিয়েছেন তাদের প্রত্যেকেরও উচিত এমন গন্তব্য ঠিক করা, যেখানে তারা পৌঁছতে পারবেন, যার মাধ্যমে কিছু একটা করতে সমর্থ হবেন।

একজন ছাত্রের শিক্ষাজীবনের শুরুতেও এমন রূপরেখা মাথায় আসতে পারে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করার আগে অবশ্যই সেই রূপরেখা পরিকল্পনা তার কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে। তাকে উপযুক্ত পরিকল্পনা বেছে নেওয়ার যোগ্য হতে হবে। তার এমন রূপরেখা লিখতে হবে যা সময়ের পরিক্রমায় সে বাস্তবায়ন করতে পারবে। যেমন: একজন মানুষ ডাক্তারি পড়ার সময় তার লক্ষ্য ঠিক রাখবে, সে গ্যাস্ট্রোলজি, মেডিসিন কিংবা হার্ট স্পেশালিস্ট হবে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেই-সংক্রান্ত পড়াশোনা করবে। সব ধরনের কনফারেন্সে যোগ দেবে এবং লেকচার শুনবে। নিজের বিষয়ের যেকোনো আলোচনায় অংশ নেবে। যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে চায়, সে বিষয়ে অভিজ্ঞদের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করবে, তা সেটা যত কঠিনই হোক না কেন।

একইভাবে প্রকৌশল, শরিয়তের জ্ঞান, আরবি ভাষা, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলোতে যারা দক্ষতা অর্জন করতে চান, তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে কেউ যদি এমনিতেও কোনো বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে চায়, সেক্ষেত্রেও একই নীতি মেনে চলতে হবে।

কখনো এই রূপরেখা প্রণয়নে দেরি হতে পারে। একজন ছাত্র হয়তো বিশেষত্ব অর্জনের ক্ষেত্র নির্ণয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে পারে। হয়তো সে এমন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে গেল, যার প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই, যে দিকে তার মন টানে না। এক্ষেত্রে তার উচিত ধৈর্য ধরা, হতাশ হলে চলবে না। 'জীবনটা অর্থহীন হয়ে গেছে'—এমনটা ভাবা কিংবা বলা ঠিক নয়। বরং তার উচিত পরবর্তী লক্ষ্য নির্ধারণ করা, যেখানে তার আগ্রহ, অনুভূতি, চিন্তা, সম্ভাবনা, দক্ষতা আর সামর্থ্যকে ঢেলে দিতে পারবে। এর জন্য সে তার স্বপ্নের সাথে খাপ খায় এমন রূপরেখা নির্ধারণ করে নেবে। তাহলেই স্বপ্ন পূরণ হবে, ইনশাআল্লাহ। কত মানুষ আছে যারা পরে এসেও অভিজ্ঞ লোকদের ছাড়িয়ে গেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ়তা, মনোযোগ, আগ্রহ আর মানসিক শক্তির দ্বারা।

চিন্তার খোরাক

এক ব্যক্তি তার ব্যাগপত্র গুছিয়ে পরিবার থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু গন্তব্য কোথায় তা জানে না। অন্য অনেকের দেখাদেখি সেও সফর করেছে, কিন্তু দিনশেষে কিছুই অর্জন করেনি। ভাঙা হৃদয়ে সে ফিরে এসেছে! যার কোনো রূপরেখা নেই তার অবস্থাও ঐ মানুষটার মতো।

অন্যদিকে আরেকজন মানুষ প্রথম দিন থেকেই জানত, বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে সে নির্ধারিত একটি দেশে সফর করবে। এর জন্য সকল প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়েছে। যার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে, সে তো এই ব্যক্তির মতোই।

লক্ষ্যবিহীন জীবন যেন এক হালবিহীন নৌকা

এই পৃষ্ঠায় পৌঁছানোর আগেই আপনি জীবনের পরিকল্পনা সাজিয়ে নিয়েছেন, নিজের ভাবনা-চিন্তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, এই প্রত্যাশাই করছি।

আপনি ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই আপনার ক্ষেত্র ঠিক করে ফেলেছেন, যেথায় আপনি আজীবন টিকে থাকতে চান। যে পরিচয় আপনি ভবিষ্যতে বহন করবেন, মৃত্যুর সময় আপনি যে স্মরণিকা রেখে যেতে চান সেটাও এর ওপর নির্ভর করে। যেমনটা কুরআনে পাওয়া যায়—

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾

আমাকে পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রাখুন।[১]

আপনি বাস্তব জীবনে নিশ্চয় এর প্রয়োগ চান। হয়তো আগামী ১০/১৫ বছরের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন। নিশ্চয়ই তার ফলাফল কেমন কিংবা ভবিষ্যতে সেই চিন্তার কী পরিণতি ডেকে আনতে পারে তা বুঝতে পারছেন।

এই দুই ধাপ পেরিয়ে আসলে তৃতীয় ধাপের সূচনা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। আপনি প্রতিদিন লক্ষ্যের কতটুকু অর্জন করতে চান তা নির্ণয় করতে হবে এবার। এটা

---

[১] সুরা শুআরা, আয়াত : ৮৪

করলে আপনার রূপরেখা কিংবা স্বপ্ন অনেকাংশে বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। সময়ের পরিক্রমায় আপনাকে পৌঁছে দেবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

রূপরেখা প্রণয়ন জীবনে অনুপ্রেরণা দেয়, চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি করে, পুনর্জাগরণের চিন্তা মূর্ত করে তোলে। কিন্তু প্রতিদিন লক্ষ্যের একটা নির্দিষ্ট মঞ্জিল অতিক্রম করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে দিনশেষে লক্ষ্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। লক্ষ্যহীন জীবন আসলে না থাকার মতোই। এমন অনেক লক্ষ্য আছে যা ব্যক্তিকে উভয় জগতে মর্যাদার স্বাদ অনুভব করিয়েছে!

লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারলেই যুদ্ধের অর্ধেক জেতা হয়ে যায়। স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে যুদ্ধের বাকি অর্ধেক। রূপরেখায় প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য না থাকলে একসময় তা অর্জন অসম্ভব হয়ে পড়বে।

একবার এক লোক তার বন্ধুদের উদ্দেশে প্রশ্ন করল, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছ, যে একাই একটা উট খেয়ে ফেলতে পারবে?' কেউই হাত তোলার সাহস করল না। তখন সে বলল, 'তোমরা কিন্তু প্রত্যেকেই আস্ত একটা উট একা খেতে পারবে। কীভাবে জানো? উটটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফ্রিজে রেখে দেবে। এরপর প্রতিদিন অল্প অল্প করে মাংস খেতে থাকবে। একদিন না একদিন উটের সবটুকু মাংস শেষ হবেই।'

পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি নিয়মিত ছোট ছোট লক্ষ্য থাকা খুব জরুরি। এ গল্পটা তারই একটা ব্যাবহারিক উদাহরণ।

আপনার রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়ে গেলে এবার প্রতিদিনকার কাজ নির্ধারণ করে ফেলুন, যেন সেই সুদীর্ঘ পথ নিয়মমাফিক পাড়ি দেওয়া যায়। আপনি যদি কুরআনকে অন্তরে ও মগজে ধারণ করতে চান, তাহলে পূর্ব শর্ত হিসেবে তাজবিদ তো ঠিক করবেনই, সেই সাথে নিয়মিত অল্প করে মুখস্থ করার পাশাপাশি বিশেষভাবে আরবি ভাষা, তাফসির শিক্ষায় সময় দেবেন। অনুরূপভাবে ফিকহ, হাদিস, তাফসির, সিরাত-সহ বিভিন্ন শাস্ত্রের ছাত্রদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

আবার আপনার যদি শিক্ষা, মিডিয়া, সমাজ, অর্থনীতি-কেন্দ্রিক এমন কোনো পরিকল্পনা থাকে, তাহলে সেটা শেষ পর্যন্ত কীভাবে বাস্তবায়ন করবেন তার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করাও জরুরি; হোক সেই লক্ষ্য আত্মোন্নয়ন কিংবা পরিকল্পনার যথাযথ পরিচালনা।

এই লক্ষ্যগুলো লিখে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। তাহলে সেগুলো চোখের সামনেই থাকবে। লক্ষ্য ঠিক করার পর দৈনিক আর সাপ্তাহিক মঞ্জিল তথা Daily Goal এবং Weekly Goal নির্ধারণ করে নেবেন। আপনার সিলেবাস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখতে পারলে ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণে সুবিধা হবে।

বাৎসরিক এবং সাপ্তাহিক এই টার্গেটগুলো আপনার পথচলাকে মসৃণ করবে। আপনাকে মূল কাজে মনোযোগী করে তুলতে সহায়তা করবে; যাতে করে আপনি জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন পূরণে সমর্থ হন।

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমাদের এমন অনেক প্রতিবন্ধক আছে যেগুলো আমাদের সময় নষ্ট করে স্বপ্নগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। যদি আপনার এমন স্পষ্ট রূপরেখা না থাকে, যা দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, তাহলে বিক্ষিপ্ততা আপনাকে খাদের কিনারায় ঠেলে দেবে।

চিন্তার খোরাক

যার লক্ষ্য একটা বড় পাথর ভাঙা, বিরাট কোনো গাছ কাটা কিংবা গভীর কূপ খনন করা; সে প্রতিদিন সকালে ঐ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বের হয়। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে ঐ কাজে লেগে থাকে। দিনশেষে বাড়ি ফিরে আসে। এভাবে প্রতিদিন সে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলে এক সময় সেই পাথর টুকরো টুকরো হয়ে যায়, গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, কূপ থেকে বেরিয়ে আসে সুমিষ্ট পানির ধারা।

গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আগে শেষ করুন

এখন পর্যন্ত মনোযোগের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপাদান (পরিকল্পনা, রূপরেখা ও লক্ষ্য) আপনি অর্জন করেছেন। আপনার একটি সাপ্তাহিক রুটিন আছে। আপনি দৃঢ় এবং বিচক্ষণ হলে আশপাশের কিছুই আপনাকে পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না, তা যতই ভয়াবহ এবং প্রভাবশালী হোক না কেন।

যার একটা পরিকল্পনা আছে, চমৎকার একটা রূপরেখা আছে, লক্ষ্য আছে—তার স্বপ্ন একদিন পূরণ হবেই। ইতিহাস তার জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী। যারাই জীবনে সফল হয়েছে, ইতিহাস রচনা করেছে, মর্যাদায় আসীন হয়েছে, বড় প্রভাব রাখতে পেরেছে; তারা সবাই পরিকল্পনা, রূপরেখা আর লক্ষ্যকে জীবনে ধারণ করতে পেরেছে।

আপনি যদি আপনার মনোযোগ-সৃষ্টির কাজে এতদূর পৌঁছে গিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার জন্য আরেকটা কাজ করা জরুরি হয়ে গেছে। প্রতিদিন কাজ শুরু করার আগে আপনি হ্যান্ডবুক খুলে লিখে রাখা লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করুন, 'আজকের দিনে কোন তিনটি লক্ষ্য সবার আগে পূরণ করা দরকার?'

প্রত্যেক দিন আপনার লক্ষ্যের তালিকায় থাকা সবগুলো দায়িত্ব পূর্ণ করার পরিকল্পনা থাকবে আপনার। রাতে বিছানায় ঘুমাতে যাওয়ার আগে সকল দায়িত্বকে সম্পন্ন করে আসতে পারাই হবে আপনার সর্বাত্মক চেষ্টা। কিন্তু এ-কথা সবারই জানা, সবসময় সব লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তাই কোন বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে আপনার দিনের সূচনা করবেন সেটাও ভেবে রাখা দরকার। যাতে কখনো কোনো বাধা এসে পড়লেও আপনার খুব একটা অসুবিধা না হয়। আমি আপনাকে বেশ জোর দিয়ে এবং দায়িত্ব নিয়েই বলছি, 'চারদিক থেকে নানা রকমের বাধা-বিপত্তি এসে পড়লেও কোনোভাবেই এই অগ্রাধিকার তালিকাটি অসম্পূর্ণ রাখা যাবে না।'

সফল মানুষদের অন্যতম গুণ হলো, তাদের প্রতিদিনের লক্ষ্য আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। আর তাদের সবচেয়ে ভালো গুণ হলো তারা তাদের দৈনিক লক্ষ্যের মধ্যে অগ্রাধিকার তালিকার প্রথম তিনটি কাজ মার্ক করে রাখে। তাই হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হলেও তারা সেই কাজগুলো শেষ না করে নিজের জায়গা থেকে একচুলও নড়ে না।

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ৮০/২০ বলে একটা কথা আছে। এর মানে হলো আপনার ৮০ ভাগ শ্রম ২০ ভাগ লক্ষ্যে ব্যয় করুন। তাহলে ৮০ ভাগ ফলাফল অর্জন করতে পারবেন।

মূলত প্রত্যেক মানুষের জীবনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। সাথে সাপ্তাহিক একটা টার্গেট সেট করা থাকবে। সেই পরিকল্পনার শর্ত হলো কিছু বিষয়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করা। যেমন: পরিকল্পনা, ঈমান, চিন্তা, পরিবার, সমাজ, স্বাস্থ্য, অর্থ। আর এ জন্য নিজের পরিকল্পনাটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া ভীষণ প্রয়োজন। প্রতিদিন সকালে অন্য কোনো কাজ সামনে আসার আগে নিজের পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তবেই দিন শুরু করুন। কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না—সবার আগে আমাদের ঈমান! কারণ ঈমানের শক্তিতেই তো জীবন পরিচালনা করতে হবে।

পরিকল্পনার ভেতরে যে বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পাবে, সেগুলো দিয়েই দিনের সূচনা করতে হবে। যদি একজন ছাত্র ফিকহে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করতে চায় তাহলে প্রতিদিন আকিদা, তাফসির, হাদিস কিংবা সিরাত পড়ার আগে অবশ্যই ফিকহ-উসুল নিয়ে দিন শুরু করবে।

এই যে প্রায়োরিটি নির্ধারণ করা, এটা মনোযোগেরই অংশ। এই মনোযোগ ব্যক্তিকে তার লক্ষ্যবিন্দুতে পৌঁছে দেয়, তার স্বপ্ন পূরণে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

প্রায়োরিটি নির্ধারণ করতে গিয়ে কোনো প্রকার কটু কথায় কর্ণপাত করবেন না, কোনো রকম বাধা-বিপত্তিকে আমলে নেবেন না। এক্ষেত্রে এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারেন। তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক। প্রথমে অফিসে ঢুকেই প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ রেখে দিতেন টেবিলে। অগ্রাধিকার তালিকার শুরুর কাজগুলো নিশ্চিন্তে করার জন্য তিনি ঐ ব্যাগটাকে চিহ্ন হিসেবে রাখতেন। এর মাধ্যমে তিনি কর্মচারীদেরকে এই বার্তাও দিতেন যে, তোমরা যে সমস্যাতেই পড়ো না কেন আমাকে বিরক্ত করবে না। আপনি চাইলে এ নিয়মটা আপনার পরিবার এবং সন্তানদের সাথেও প্রয়োগ করতে পারেন (বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অবশ্য)।

আপনার প্রতিদিনের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত টার্গেট পূরণের জন্য তিনটে উপায় বাতলে দিই।

প্রথমত, জানার চেষ্টা করুন, কোন বিষয়গুলো মূলত আপনি অগ্রাধিকার দিতে চান। সেটা ঘুমানোর আগে কিংবা সকালে লিখে রাখুন।

দ্বিতীয়ত, আপনি সেটার অনুশীলন শুরু করে দিন। শুরুর দিনগুলোতে যত কষ্টই হোক, অগ্রাধিকার তালিকার নির্ধারিত কাজ ছেড়ে অন্য কিছু করতে যাবেন না।

তৃতীয়ত, আপনার সেই কাজটা যদি পরিমাণে বড় হয়, তাহলে ছোট ছোট ভাগ করে নিন। তারপর সেই ভাগগুলো একটা একটা করে পূর্ণ করে ফেলুন, যতক্ষণ না আপনি পুরোটা সমাপ্ত করতে পারেন। আর যদি ভাগ করতে না পারেন, তাহলে সময় ভাগ করে নিন। যেমন : ২০ মিনিট কাজ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এরপর আবার ২০ মিনিট কাজ করবেন।

আপনি যখন অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তখন মোবাইলটা পুরোপুরি বন্ধ রাখুন। আপনার কাছ থেকে ১০ হাত দূরে রাখুন। কাজটা শেষ না

করার আগে মোবাইল চালু করবেন না। একইভাবে নিউজফিডে চোখ বোলানো, টিভি দেখা, যেকোনো সমস্যায় পড়ে থেমে যাওয়া থেকেও সতর্ক থাকবেন।

চিন্তার খোরাক

দিনের শুরুতেই শেষ করে দিন ব্যাঙটাকে। কারণ সেটাকে শেষ করে দিলে আপনি সুন্দরভাবে দিনটা শেষ করতে পারবেন। সারাদিন আপনাকে এর চেয়ে খারাপ কিছুর মুখোমুখি হতে হবে না। [আপনার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কাজগুলো মূলত সেই ব্যাঙের সাথে তুলনা করা যায়, যেটাকে সকাল সকাল শেষ করে দিতে হবে]

অল্প কাজে বেশি ফায়দা

ইবনু শিহাব যুহরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইউনুস, তুমি জোর করে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করবে না। জ্ঞানের বেশ কয়েকটা প্রান্তর আছে। কোনো কোনো প্রান্তরে প্রবেশ করলে তুমি সেটাকে অতিক্রম করার আগে তোমাকে সেটা ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পরিশ্রম করে জ্ঞানার্জন করো। একবারে সবটুকু জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করবে না কখনো। যে একবারে জ্ঞান লাভ করে, তার জ্ঞান একবারেই হারিয়ে যায়। তাই অল্প অল্প করে বহু দিনরাত ধৈর্য ধরে জ্ঞান আহরণ করতে থাকো।'[১]

ইবনু শিহাব যুহরি বলতেন, ইলম তো একটা-দুইটা করে হাদিস নেওয়ার নাম। আজ একটু তো কাল আরেকটু। এভাবে অল্প অল্প করে ইলম কুড়িয়ে নিতে হবে। কবির ভাষায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল; গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।

অল্প হলেও নিয়মিত

এই চারটি জিনিস (পরিকল্পনা, রূপরেখা, দৈনন্দিন লক্ষ্য এবং অগ্রাধিকার নির্ণয়) ব্যক্তি জীবনে মনোযোগ তৈরিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। এটিই তাকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তাকে পথের সমাপ্তি রেখায় নিয়ে যায়। এগুলো মনোযোগের

---

[১] ইবনু আব্দিল বার তার *জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহি* গ্রন্থে ইউনুস ইবনু ইয়াযিদের সূত্রে বর্ণনা করেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কোনো মানুষের জীবনে যদি এ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা তাকে দেরিতে হলেও স্বপ্ন পূরণ করিয়েই ছাড়বে। আর কোনো মানুষ যদি এগুলো আঁকড়ে ধরতে না পারে, তাহলে সে নিক্ষিপ্ত হবে বিক্ষিপ্ততার আস্তাকুঁড়ে।

মনোযোগ স্থাপনে আরো যে বিষয়টি সহায়তা করে তা হলো নবিজির শিখিয়ে দেওয়া 'অল্প হলেও নিয়মিত' নীতি[১]। আমি আপনার কল্যাণকামী হিসেবে বলছি, এর ব্যাপারে কখনো অবহেলা করবেন না। যাদেরই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, স্বপ্ন অধরা থেকে গেছে; তারা সবাই এই বিষয়টিকে অবহেলা করেছেন বলেই হয়েছে। কিন্তু সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর আফসোস করে কি লাভ হয় কখনো?

একজন লোক পুরো ২৩ খণ্ড *সিয়ারু আলামিন নুবালা* এবং ৩৪ খণ্ড *মুসনাদু আহমাদ* পড়েছে; সে কেবল প্রতিদিন ঘুমানোর আগে মাত্র ২০ মিনিট করে পড়ত।

একদল ছাত্র শাইখ ইবনু উসাইমিনের *শারহুল মুমতি* বইটি প্রতিদিন এক ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা করে পড়ত। এভাবে আড়াই বছরের মাথায় তারা পুরোটা শেষ করে ফেলেছে।

এক ব্যক্তি একটা মূল্যবান কথা বলেছিলেন, ২২ বছর আগে আমি সফলতা অর্জনের একটা উপায় জেনেছি। সফলতার বিষয়টা কাজের পরিমাণের চাইতে নিয়মিত করার সাথেই বেশি জড়িত। বড় কিছু অর্জন করা কিংবা বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আজীবন কোনো একটা কাজ নিয়মিত করে যাওয়াটাই যথেষ্ট।

সফলতা অর্জনের লক্ষ্য ছাড়াই কেবল প্রতিদিন একটা নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তুলুন। তিন মাসে পুরো কুরআন মুখস্থ করার চিন্তা মাথায় নেবেন না। প্রতিদিন আধা পৃষ্ঠা মুখস্থ করুন। শরীর গঠন নিয়ে ব্যস্ত হবেন না, প্রতিদিন কেবল আধা ঘণ্টা করে শরীরচর্চা করুন। রাতারাতি কোনো একটি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের গুরুভার নেওয়াটা বেশ বোকামি, তারচেয়ে বরং প্রতিদিন সেই বিষয়ের কয়েক পৃষ্ঠা করে পড়তে থাকুন। বড় কোনো কাজ কিংবা দুই মাসে ৩০ কেজি কমানোর মতো দায়িত্ব

---

[১] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ—আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে অল্প।—*সহিহ বুখারি*: ৬৪৬৪

নিতে যাবেন না। বরং সারাটা জীবন একটা সুষম খাদ্যাভ্যাস ধরে রাখুন।

সোজা কথায়, জীবন এমনিই চলে যাবে। আপনি যদি একটা ভালো অভ্যাস অল্প করে হলেও নিয়মিত ধরে রাখেন, দুয়েক বছরের মাথায় দেখবেন সেই লক্ষ্য খুব সহজেই অর্জিত হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, সেটা ছাড়িয়ে বহুদূর চলে যাবেন। অন্য কাউকে অবাক করার আগে আপনিই অবাক হয়ে যাবেন।

ধরা যাক, আপনি প্রতিদিন একটা ঘণ্টা কিছু কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিলেন। ১৫ মিনিট কুরআন মুখস্থ, ১৫ মিনিট হাঁটা, ১৫ মিনিট কোনো একটা বই পড়া ইত্যাদি। কয়েক বছর পর আপনি অবাক হয়ে দেখবেন কুরআন মুখস্থ হয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ! আপনার শরীরও বেশ সুগঠিত হয়েছে, ১০/১২টি বই পড়া শেষ। আর এ সবই দিনের একটা ঘণ্টা কাজে লাগানোর মাধ্যমে। বাকি ২৩ ঘণ্টার কথা নাহয় বাদই দিলাম।

'অল্প হলেও নিয়মিত'—এই নীতিটা সবচেয়ে কার্যকরী, ভবিষ্যতে কিছু অর্জনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে এটা। আপনি খেয়াল করে দেখবেন, কল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে এক সময় বিশাল একটি বালতি পূর্ণ হয়ে যায়। অথচ এভাবে যে একসময় বালতিটি ভরে যাবে, এমনটা হয়তো আশাও করেননি আপনি। এর কারণ ক্রমাগত চালিয়ে যাওয়া।

কোনো ধরনের বিরতি ছাড়া কোনো কাজ ধরে রাখতে পারলে মনোযোগের শক্ত ভিত্তি স্থাপিত হয়। তুলনামূলক কম কষ্টে গন্তব্যে পৌঁছানো যায়।

আপনি যদি জীবনে কিছু অর্জন করতে চান, তাহলে পরিমাণ নিয়ে কখনো দুশ্চিন্তা করবেন না। বরং নিয়মিত হওয়াটাকে গুরুত্ব দিন। যতটুক নির্ধারণ করে নিয়েছেন ততটুকুই ধরে রাখুন। কীভাবে যে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন, টেরও পাবেন না। কোনো একদিন আপনার বড় স্বপ্নটাও এভাবেই পূরণ হয়ে যাবে।

সাইয়্যিদ আলি ইবনু ইবরাহিম ইবনি আহমাদ ইবনি আমির রাহিমাহুল্লাহর[১] ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে ইমাম শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি শিক্ষকতায় সময় দেওয়ার পরও এত বেশি কীভাবে লিখতেন তা নিয়ে বেশ অবাক হতাম আমি।

---

[১] জন্ম : ১১৩৪ হিজরি; মৃত্যু : ১২০৭ হিজরি

একদিন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, 'এক দিনের জন্যও আমি লেখা বন্ধ করি না। যদি কখনো কোনো ব্যস্ততা এসেও পড়ে, তবু অন্তত দুয়েক লাইন হলেও লিখে রাখি। শাওকানি বলেন, 'আমি তার নীতি অনুসরণ করে বেশ উপকৃত হয়েছি।'[১]

চিন্তার খোরাক

আমাদের প্রতিবন্ধকতা কখনো জ্ঞানস্বল্পতা নয়, বরং মূল সমস্যা হচ্ছে, জ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা এবং শেষ অবধি এই নীতিতে অবিচল না থাকা।

মনোযোগের পরিচয়

একজন আমাকে বলল, 'আমি মাগরিব আর এশার সালাত মিলিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো কুরআন পড়ে শেষ করছি। এখন সুরা ইসরায় আছি।'[২]

'না' বলতে লজ্জা কীসের?

আপনার অগ্রাধিকারে বাধা দেয় এমন প্রতিটি কাজকে 'না' বলতে শিখুন, আপাতদৃষ্টিতে সেটা জরুরি মনে হলেও। মনোযোগ তৈরিতে এই কাজটি বড়সড় ভূমিকা রাখে।

আমাদের একটা সমস্যা হলো, আমরা লক্ষ্য লিখে রাখি ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ কোনো কাজ এসে পড়লে সমন্বয় করতে না পেরে তালগোল পাকিয়ে ফেলি। উড়ে এসে জুড়ে বসা কাজটা আমাদের প্রায়োরিটি লিস্টে স্থান করে নেয়। আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলো তখন গৌণ হয়ে যায়।

আমরা যদি সব কিছুকে গ্রহণ করি, জরুরি যেকোনো আহ্বানে সাড়া দিই; তাহলে দিনশেষে আমরা কিছু মানুষের খেলার পুতুলে পরিণত হব। তারা তাদের ইচ্ছেমতো আমাদেরকে পরিচালিত করবে, যদিও সেটা আমাদের স্বপ্ন পূরণের অন্তরায় হয়।

---

[১] *আল-বাদরুত তালি'*

[২] নবিজির শেখানো 'অল্প হলেও নিয়মিত' নীতি বাস্তবায়নের একটি চমৎকার নমুনা।

যেকেউ আপনার কাছে কোনো অনুরোধ করলে প্রথমে তাকে বলুন, 'আমি আগে আমার শিডিউল দেখে নিই।' তিনি চেয়েছেন বলে তখনই তাকে হ্যাঁ বা না উত্তর দিতে যাবেন না। তাকে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করুন। তাড়াহুড়ো করবেন না। তাকে বিনয়ের সাথে বুঝিয়ে বলুন, কারো শিডিউলে প্রবেশ করতে হলে অপেক্ষা করতে হয়। আপনি যেহেতু দেরি করে এসেছেন, কাজেই দেরি করার দায়ভার আপনাকেই নিতে হবে। আপনার গড়িমসির চাকা দিয়ে আপনি অন্যের স্বপ্নকে পিষ্ট করতে পারেন না।

ভদ্র ভাষায় 'আমার টাইম-টেবিলটা দেখে নিই' বলার মাধ্যমে আপনি জায়গামতো 'হ্যাঁ' বলা শিখলেন, উপযুক্ত স্থানে সেটা বসাতে পারলেন। এতে করে আপনার পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটবে না। আপনি তাড়াহুড়ো করে নিজেকে এমন কোনো কাজে জড়িয়ে ফেলবেন না যা আপনার প্রায়োরিটি নষ্ট করে, আপনার পরিকল্পনায় বাঁধ সাধে।

যখন 'আমি পারব না', 'ব্যস্ত আছি', 'আমার অন্য কাজ আছে'—এগুলো বলতে শিখবেন, তখন মানুষকে সময়ের গুরুত্বের ব্যাপারে ধারণা দিতে পারবেন। তাদেরকে বোঝাতে পারবেন সময় কতটা দামি। তাদের ভবিষ্যতে রুটিনমাফিক জীবনযাপন করার ক্ষেত্রে হয়তো আপনি সহায়ক ভূমিকা রাখবেন।

আমরা যখন আপনাকে বলি, 'না' বলতে শিখুন, তার মানে এই নয়, আপনাকে স্বার্থপর হতে বলছি, মানুষকে সহায়তা করতে নিষেধ করছি কিংবা আপনার কাজে লাগবে এমন কোনো প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে বলছি। বরং এটা কেবল আপনার সময়, লক্ষ্য আর অগ্রাধিকারকে সম্মান করার আহ্বান, যাতে আপনি নিজের বৃহত্তর লক্ষ্য ও প্রকল্প বাস্তবায়নকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। এরপর মানুষের প্রয়োজন কিংবা অগ্রাধিকার পূরণে সময় দিলে কোনো অসুবিধা নেই।

আমরা যে লক্ষ্য এবং চিন্তার জন্য জীবন ধারণ করি, সেটার তরে সংগ্রাম করতে শেখায় মনোযোগ। এর জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সবার কাছে আমরা দুঃখ প্রকাশ করে 'না' বলব।

আমরা এমন সমাজে বসবাস করি যেখানে এমন অনেক অভ্যাস আছে, যেগুলো আপনার সময় নষ্ট করে, আপনার মনোযোগ কেড়ে নেয় এবং আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো নস্যাৎ করে দেয়। সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম, গ্রুপ চ্যাট, অযথা আড্ডা, ঘনঘন আনুষ্ঠানিক দাওয়াতের আয়োজন আমাদের কত বড় ক্ষতি করছে আমরা বুঝতেও পারছি না।

একজন মানুষ দ্বীনের সীমারেখার মধ্যে থেকে যেকোনো কাজে অংশ নিতে পারে। নিজেকে এমন অনেক অভ্যাস থেকে মুক্ত করে নিতে পারে যেগুলো কিছুদিন পর জীবনের অমূল্য মুহূর্তগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

চিন্তার খোরাক

আপনি যদি প্রতিটা চাপিয়ে দেওয়া কাজে সাড়া দিতে থাকেন, প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দেন, প্রতিটা বিষয়ে অংশ নিতে শুরু করেন; তাহলে আপনার চাকরি করা উচিত অ্যাম্বুলেন্সে অথবা রিসেপশনিস্ট হিসেবে। বড় কোনো লক্ষ্য অর্জন আপনাকে দিয়ে হবে না!

জীবনের বার্তা

টাকার জন্য জীবন নয়, বরং জীবনের জন্য টাকা। অর্থ-কড়ি আমার জীবনকে পরিচালিত করতে পারত, কিন্তু আল্লাহর অপার করুণায় আমি তা হতে দিইনি। আমি এমন কাজ করিনি যা আমার চিন্তা বা পরিকল্পনার সাথে সাংঘর্ষিক। আমি সারাজীবন এমন কিছুই করেছি যেগুলো আমার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করবে। আমি মেয়েদের অনুষদে লেকচার দিতাম। সেখান থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত দু-চারটার বেশি অতিরিক্ত লেকচার দিইনি; যাতে সেই লেকচারগুলো আমার জ্ঞানার্জন প্রকল্পের অংশ হয়।

মেয়েদের অনুষদের সামনে যে রাস্তা, তার উল্টো পাশেই আমি বাসা নিয়েছিলাম; যাতে যাওয়া-আসায় সময় নষ্ট না হয়।

সারাটা জীবন কখনো আমি কোনো প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব নিইনি। কখনো কোনো অনুষদ, কমিটি বা বিভাগের প্রধান হইনি। নিউইয়র্কে অবস্থিত আরব বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বক্ষণিক প্রতিনিধি দলে পরামর্শদাতা হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছি। তবে সেটাও আমার জ্ঞানার্জন প্রকল্পের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। মোটা অঙ্কের সম্মানি-সহ জাতিসংঘে কাজ করার প্রস্তাব পেয়েও আমি নিজের চাকরিতেই অটল ছিলাম। টাকাপয়সার আহ্বানকে উপেক্ষা করেছি। কারণ নতুন চাকরিতে আমার বেশিরভাগ সময়ই কেটে যাবে; এতে আমার পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হবে।[১]

---

[১] আব্দুল ওয়াহ্হাব মাসিরির আত্মজীবনী গ্রন্থ *রিহলাতি আল-ফিকরিয়্যা* থেকে নেওয়া।

লেগে থাকুন চর্চার সাথে

কোনো ভালো কাজ শেখার পর, তার মাঝে আরো নতুনত্ব আনার তাড়না মনোযোগ বৃদ্ধির অসাধারণ উপায়। প্রায় প্রতিটি কাজই বারবার চর্চা করা অত্যাবশ্যক; যাতে কালপরিক্রমায় সেগুলো পরিণত হয় অভিনব অবদানে।

যে কাজে আপনি সময় দেবেন, আপনার সমস্ত অনুভূতি নিয়োজিত করবেন; তার কারণেই হয়তো কবরে পৌঁছে গেলেও আপনার আমলনামায় ভালো কিছু যোগ হতে থাকবে। আল্লাহ চাইলে আপনার অনন্য প্রকল্প শত শত বছর ধরে মানুষের উপকারে লেগে যাবে। ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কোনো ব্যক্তি যে কাজে জীবন কাটাবে, তার মৃত্যুও সেটার ওপর হবে এবং সে ঐ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। মহান আল্লাহ তার বদান্যতার মাধ্যমে এটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।'[১]

অনুশীলন আর চর্চা চালিয়ে গেলে কিছুদিন পর দেখবেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আপনার জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নেবে এই অনুশীলনের মানসিকতা। আমরা প্রতিদিন অন্তত আধা ঘণ্টা পড়ার মাধ্যমে অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। অথবা অন্তত ১৫ মিনিট করে হলেও যেন পড়ি, তবে তা হতে হবে নিয়মিত। চাইলে আস্তে আস্তে পরিমাণটা বাড়ানো যায়। আর এই অনুশীলনের জন্য অবশ্যই মোবাইলের মতো মনোযোগ-বিনাশকারী বস্তুগুলো দূরে সরিয়ে রাখুন, বদভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করুন। মোবাইলের সাথে দূরত্ব তৈরি করতে আপনি একটা সহজ কিন্তু কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। মাঝে মাঝে মোবাইল ছাড়াই বাসা থেকে বের হয়ে যান। মোবাইল যতই প্রয়োজনীয় মনে হোক না কেন, সপ্তাহের দুয়েক দিন মোবাইল বাসায় রেখেই অফিস চলে যান। দেখবেন, কিছুদিন বাদে এটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে এবং মোবাইল ছাড়াও চলতে-ফিরতে আপনার তেমন একটা কষ্ট হচ্ছে না। এভাবে ধীরে ধীরে নিজের ভেতর একটা দৃঢ়তা আনা সম্ভব। কুরআন মুখস্থ করা এবং নিয়মিত চর্চা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ফজরের পর থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়টা নির্ধারণ করা যেতে পারে। আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের জন্য সপ্তাহে এক ঘণ্টা বরাদ্দ রাখুন এবং এ অভ্যাস যেন ভেঙে না যায় সেদিকেও নজর রাখুন। একদিন ধীরে ধীরে সেটা চমৎকার এক অভ্যাসে পরিণত হবে। বারবার কোনো একটা কাজ করতে করতে তাতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারব,

---

[১] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৮৭

নিজেদেরকে সেটার আলোকে গড়ে নিতে সক্ষম হব। দেখা যাবে, এসব কাজ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাইলেও আর তা ছাড়তে পারছি না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনোযোগ তৈরির উপায় হলো এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা। আর সেই সময়টাতে একটার বেশি কাজে জড়িয়ে পড়া অনুচিত। যেকোনো একটি কাজে নিজের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত মনোযোগ সরানো যাবে না। এভাবে চিন্তার একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়, বিক্ষিপ্ততা থেকে মুক্তি মেলে। সকল শক্তি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ব্যয় হয়, স্বপ্নপূরণ তখন অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ হয়।

আমার জীবনে আমি এই বিষয়টা কাজে লাগিয়েছি, বিশেষ করে বই লেখার ক্ষেত্রে। এতে এত বেশি উপকৃত হয়েছি যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আমার বেশিরভাগ বই এই অভ্যাসেরই ফসল। *ইবদা কিতাবাতা হায়াতিকা* বইটা আমি ১০ দিনে লিখেছি। *ফি যিলালিস সীরাতিন নাবাউইয়্যা* বইয়ের কাজ শুরু করার পর শেষ না করা পর্যন্ত আমি কলম বন্ধ করিনি। আর *রিহলাতু তাদাব্বর*-এর সাথে তো আমার সেরা স্মৃতিটুকু মিশে আছে। আমি টানা ছয় মাস কাজ করে বইটা শেষ করেছি। তার মাঝে একদিন টানা ১৩ ঘণ্টাও কাজ করেছি, মাঝে কেবল সালাত আর ঘুমের জন্যই বিরতি নিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ তাআলা আমাকে সেটা পূর্ণ করার তৌফিক দিয়েছেন। কুরআনের এমন কিছু সুরাও আছে যেগুলোর তাদাব্বর[১] আমি এয়ারপোর্টে লিখেছি, প্লেনে বসে লিখেছি, এমনকি রাস্তাঘাটেও লিখেছি। আর ভূমিকাটা লিখেছি কোনো এক সফরের সময় হোটেলে বসে খাবারের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, এখনো আমার অধিকাংশ প্রকল্প আমি এভাবেই বাস্তবায়ন করি। অনেক সময় এমনও হয়েছে, আমি অন্য কাজগুলো করি না। এমনকি আমার লাইব্রেরি গুছাই না, বই সরাই না। যেন একদমই সময় নষ্ট করতে না হয় সে উদ্দেশ্যে বিশৃঙ্খলার মাঝে কাজের মনোযোগকে শৃঙ্খলিত করি।

---

[১] চিন্তা-গবেষণা

নিজেদেরকে সেটার আলোকে গড়ে নিতে সক্ষম হব। দেখা যাবে, এসব কাজ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাইলেও আর তা ছাড়তে পারছি না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনোযোগ তৈরির উপায় হলো এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা। আর সেই সময়টাতে একটার বেশি কাজে জড়িয়ে পড়া অনুচিত। যেকোনো একটি কাজে নিজের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত মনোযোগ সরানো যাবে না। এভাবে চিন্তার একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়, বিক্ষিপ্ততা থেকে মুক্তি মেলে। সকল শক্তি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ব্যয় হয়, স্বপ্নপূরণ তখন অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ হয়।

আমার জীবনে আমি এই বিষয়টা কাজে লাগিয়েছি, বিশেষ করে বই লেখার ক্ষেত্রে। এতে এত বেশি উপকৃত হয়েছি যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আমার বেশিরভাগ বই এই অভ্যাসেরই ফসল। *ইবদা কিতাবাতা হায়াতিকা* বইটা আমি ১০ দিনে লিখেছি। *ফি যিলালিস সীরাতিন নাবাউইয়্যা* বইয়ের কাজ শুরু করার পর শেষ না করা পর্যন্ত আমি কলম বন্ধ করিনি। আর *রিহলাতু তাদাব্বুর*-এর সাথে তো আমার সেরা স্মৃতিটুকু মিশে আছে। আমি টানা ছয় মাস কাজ করে বইটা শেষ করেছি। তার মাঝে একদিন টানা ১৩ ঘণ্টাও কাজ করেছি, মাঝে কেবল সালাত আর ঘুমের জন্যই বিরতি নিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ তাআলা আমাকে সেটা পূর্ণ করার তৌফিক দিয়েছেন। কুরআনের এমন কিছু সুরাও আছে যেগুলোর তাদাব্বুর[১] আমি এয়ারপোর্টে লিখেছি, প্লেনে বসে লিখেছি, এমনকি রাস্তাঘাটেও লিখেছি। আর ভূমিকাটা লিখেছি কোনো এক সফরের সময় হোটেলে বসে খাবারের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, এখনো আমার অধিকাংশ প্রকল্প আমি এভাবেই বাস্তবায়ন করি। অনেক সময় এমনও হয়েছে, আমি অন্য কাজগুলো করি না। এমনকি আমার লাইব্রেরি গুছাই না, বই সরাই না। যেন একদমই সময় নষ্ট করতে না হয় সে উদ্দেশ্যে বিশৃঙ্খলার মাঝে কাজের মনোযোগকে শৃঙ্খলিত করি।

---

[১] চিন্তা-গবেষণা

কোনো মানুষ যদি কিছু করতে চায়, চেষ্টা থাকলে সে অবশ্যই তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। কোনো পরিকল্পনার সাথে যদি তার হৃদয়-মন এঁটে যায়; তাহলে সে সব অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। সব ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

চিন্তার খোরাক

নিজের জন্য অল্প সময়ের (১৫/২০ মিনিট) একটা ভালো অভ্যাস গড়ে নিন। শুরুর একটা তারিখ ঠিক করুন। তারপর তাকে এমনভাবে জীবনের সাথে জড়িয়ে নিন যাতে কোনো বাধাতেই থেমে না যায়, কোনো কিছুতেই ছুটে না যায়। প্রথম বছরের শেষে আপনার অনুশীলন ও চর্চার হাল-হাকিকত পর্যবেক্ষণ করুন, আপনি অবাক হবেন।

স্বপ্ন এবার সত্যি করুন

একজন তালিবুল ইলম যদি *আরবাউন নাবাউইয়্যা* কিংবা *বুলুগুল মারাম* বইটি বারবার পড়ে, সেটা তার জন্য আরও অনেক বই পড়া থেকে হাজার গুণে উত্তম। একটা বিষয়ে একটা বই বারবার পড়া, ঐ বিষয়ে আরো দশটা বই পড়া থেকে বেশি কার্যকরী।

খ্যাতিমান মনীষীদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে যেগুলো আপনার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে—

» ইসমাইল ইবনু ইয়াহইয়া আল-মুযানি বলেন, আমি শাফিয়ির *রিসালাহ* বইটি ৫ শ' বার পড়েছি।

» সুলাইমান ইবনু ইবরাহিমুদ্দিন আল-ইলকি *সহিহ বুখারি* ৫০ বারের বেশি পড়েছেন।

» ফকিহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি সালেহ বাকর আল-আবহুরি বলেন, তিনি ৫ শ' বার *মুখতাসার ইবনু আব্দিল হাকাম*, ৭৫ বার *আসাদিয়্যা*, ৪৫ বার *মুয়াত্তা* এবং ৭০ বার *মুখতাসারুল মুযানি* পড়েছেন।

» কিছু নাহুবিদ[১] আছেন যারা প্রতি দুই সপ্তাহে একবার সিবাওয়াইর *আল-কিতাব* শেষ করতেন।

» ইমাম নববি ইমাম গাযালির *ওয়াসিত্ব* বইটা ৪ শ' বার পড়েছিলেন।

» শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারি ২০ বার *ফাতহুল বারি* পড়েছিলেন।

» শাইখ ইবনু বায *শারহে মুসলিম* পড়েছিলেন ৩০ বার।

» শাইখ আহমদ হাত্বিবা তার ছাত্রদেরকে ৮ বার *মুগনি* পড়ান, ১০ বারের বেশি *মানারুস সাবিল* পড়ান।

সত্যি বলতে আমাদের জীবনে যে অভ্যাসটা সবচেয়ে বেশি কাজে দেয় আর উপকারে আসে, তা হলো এই পুনরাবৃত্তি। এমন বহু মানুষ আছে যারা তাড়াহুড়ো করে অনেক কিছু পড়ে ফেলে, কিন্তু দিনশেষে কিছুই মনে রাখতে পারে না। বইয়ের নামটা পর্যন্ত ভুলে যায়, বইয়ে যা আছে তা তো অনেক পরের বিষয়।

বারবার অনুশীলন শুধু জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে না, সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কোনো মানুষ যদি স্ত্রী-সন্তান কিংবা ছাত্রকে বছরে একটি কিংবা দুটি অভ্যাস গড়ে দিতে পারে, তাহলে তা তাদের জীবনে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করবে।

একইভাবে যারা একটা অভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিয়েছে, সেটাকে নিয়ে দীর্ঘ সময় ব্যস্ত ছিল; তারা সেই বিষয়ে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়। আবার এমনও অনেক লোক আছে যারা অনেক অভ্যাস একত্রে ধারণ করতে গিয়ে কিছুই অর্জন করতে পারেনি।

আপনি খেলোয়াড়দের দেখলে অবাক হবেন। এমন অনেক বাস্কেটবল খেলোয়াড় আছেন যারা কখনোই বাস্কেটে বল ফেলতে মিস করেন না। কারণ দিনের পর দিন অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি এটা আয়ত্ত করেছেন। আর এজন্য তাকে প্রতিদিন সাত ঘণ্টা করে প্র্যাকটিস করতে হয়েছে। একবার টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নের কাছে তার সফলতার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি ১০ বছর ধরে চ্যাম্পিয়ন। এটাই আমার স্বপ্ন ছিল, তাই টার্গেট অনুযায়ী অগ্রসর হয়েছি।

---

[১] ব্যাকরণবিদ

অবশেষে লক্ষ্যে পৌঁছেছি।'

যে পাথরটা ভাঙা হয়, সেটা কিন্তু বারবার আঘাত করেই ভাঙতে হয়।

যে পথে হেঁটে মানুষ তার গন্তব্যে পৌঁছে, তা হয়তো অতি দীর্ঘ। কিন্তু মানুষকে তার শেষ অবধি পৌঁছতে হলে নিরন্তর কষ্ট করে যেতে হয়, দীর্ঘ সফরের প্রয়োজন পড়ে, অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। এভাবে যে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী একজন ব্যক্তি নিজের দিকে মনঃসংযোগ নিবদ্ধ করে, অন্যদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয় না, তার লক্ষ্য থাকে গন্তব্য ছোঁয়া; সে-ই অন্যদের আগে পৌঁছে যায়। কিন্তু যখনই কেউ অন্যের দিকে মনোযোগ দিয়ে সময় নষ্ট করে; তখনই প্রতিযোগিতার খেই হারিয়ে ফেলে।

চিন্তার খোরাক

আপনি অভ্যাস গড়ে তোলা অথবা লক্ষ্য পূরণ করার জন্য যে পরিশ্রম করছেন, একদিন হয়তো সেটা এমন এক ট্রেইনিং সেন্টারে রূপ নেবে; যেখানে বহু মানুষ শিখতে আসবে। ভবিষ্যতে নতুনরা একই পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। তাই পথের শুরুতে যত রকমের বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন, কখনো থেমে যাবেন না।

বার্তা

আমি ভালো লিখতে পারি না বলে উচ্চ মাধ্যমিকে দুইবার ফেইল করেছিলাম। কিন্তু আজব ব্যাপার, আমার বই এখন নিউইয়র্ক টাইমসের সর্বাধিক বিক্রিত বইগুলোর একটি![১]

শৃঙ্খলা মানেই বন্দিত্ব নয়

কোনোদিন লক্ষ্য ব্যর্থ হচ্ছে হঠাৎ ঘুরতে যাওয়ার শখে, কখনো সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমের কোনো গরম খবরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে—এভাবে শৃঙ্খলাহীন জীবন আমাদেরকে লক্ষ্য থেকে আলোকবর্ষ দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। রুটিনমাফিক জীবনে অভ্যস্ত না হওয়ায় কত রুটিন করার পর বাতিল করতে হয় তার হিসেব নেই।

---

[১] রবার্ট টি-এর বাণী।

বিশৃঙ্খল জীবনে রুটিন যেন বন্দিত্বের গুমোট পরিবেশ তৈরি করে। এভাবে বারবার পরিকল্পনা বাতিল করে চোরাবালিতে হারিয়ে যায় সময় আর উৎসাহ।

যারা সুশৃঙ্খল হতে পারে, তারাই জীবন গড়ে। তাদের পক্ষেই কেবল সঠিক পথে অবিচল থাকা সম্ভব হয়। আপনি যদি তাদের পথে চলতে চান, তাহলে আপনাকেও সুশৃঙ্খল জীবন গঠনে মনোযোগ দিতে হবে। কোনোভাবেই আপনার পরিকল্পনা, চিন্তা আর সময়কে ছাড় দেবেন না। পথে হাজার রকমের সমস্যা এসে পড়লেও অটল থাকতে হবে। আপনি যেকোনো চিন্তা, পরিকল্পনা প্রণয়ন, দক্ষতা অর্জন অথবা অভ্যাস তৈরি শুরু করলে শেষ না দেখে ছাড়বেন না।

আমাদের সবচেয়ে বাজে অভ্যাস হলো আমরা কোনো পরিকল্পনা হাতে নিলে দুদিন পরেই তা ছেড়ে দিই। দৃঢ়তা না থাকলে অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব নয়। চিন্তার সাথে নিজেকে জুড়ে রাখতে হবে, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে সংগ্রাম চালাতে হবে। পথ যত দীর্ঘ হোক, গন্তব্যে পৌঁছানোর মতো দৃঢ়তা বুকে ধারণ করতে হবে।

বহু মানুষ আছে যারা কুরআন পড়া শুরু করেছিল। অনেক মানুষ বইপড়ার অভ্যাস গড়েছিল। কতশত লোক আছে যারা শরীরচর্চা শুরু করেছিল। কিন্তু পথের শুরুতে বা মাঝে এসে থেমে গেছে। শেষ করার আগেই তারা অভ্যাসটা ছেড়ে দিয়েছিল। তাই পরিশেষে তাদের জন্য আফসোস ছাড়া আর কিছুই বাকি ছিল না।

আমরাও যদি একই অবস্থায় পড়ি, তাহলে ঝড়ের আভাস পেয়েই হাল ছেড়ে দেওয়া বোকাদের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে কেবল।

কোনো কোনো শিক্ষার্থী এমন আছে, যারা কুরআন মুখস্থ করতে মাত্র দুই মাস সময় নিয়েছে। তারপর তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ঘরে বসে *সহিহ বুখারির* 'মুখতাসার[১]' আয়ত্ত করেছে ২ মাসে। আবার কেউ কেউ পুরো একটা সেমিস্টারজুড়ে ইংরেজি শিখেছে। সেমিস্টার শেষ হওয়ার আগে তারা ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করেছে। দুই-তিন বছরের মাথায় নিছক প্রচেষ্টা বলে একজন দরিদ্র মানুষ রূপান্তরিত হয়েছে ধনী ব্যক্তিতে, যাকাতগ্রহীতা পরিণত হয়েছে যাকাতদাতায়। আমি এমন অনেক স্থূলকায় ব্যক্তির কথা জানি, যারা আসন্ন ক্ষতির কথা চিন্তা করে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে ডায়েট শুরু করেছে, যা তারা আগে কোনোদিন

---

[১] সংক্ষিপ্তরূপ

কল্পনাও করেনি। কয়েক মাসের মধ্যেই তারা স্থূলতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে লাভ করেছে নতুন জীবন।

ইমাম শাফিয়ি বলেন, আমি যখন *আহকামুল কুরআন* লিখতে চাইলাম, তখন ১ শ' বার কুরআন পড়লাম।

চিন্তার খোরাক

আপনি যদি প্রতিদিন কুরআনের মাত্র তিনটি আয়াত মুখস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে ৮ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করে ফেলতে পারবেন। আর যদি প্রতি সপ্তাহে এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করে সেটা দিন-রাত চর্চা করতে থাকেন; তাহলে ১২ বছরের মাথায় আপনার পুরো কুরআন মুখস্থ হয়ে যাবে। এভাবে অনেক মানুষ ২০ বছর ধরে একই পরিকল্পনা ধরে রেখেছে, যদিও তারা কখনো লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

শৃঙ্খলাই মহামানবদের বৈশিষ্ট্য

শাইখ ইবনু বায যখন দালমে বিচারক পদে ছিলেন তখন *উসুলুস সালাসাহ* বইটি ১ শ' বার পড়েন।

মোক্ষম সময়

জীবনে সফল হতে নিজেকে আদ্যোপান্ত জানতে হবে। নিজের সুবিধা-অসুবিধা, আগ্রহ, মনোযোগ—এসবের প্রতি নজর দিলে সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো অনেক সহজ হয়ে যাবে। আসলে সাফল্য ও ব্যর্থতার মাঝে পার্থক্য গড়ে দেয় আমাদের মেধা, শ্রম আর সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার।

আমরা প্রত্যেকে চাই আমাদের সক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে জানতে। আমাদের কেউ রাত জেগে কাজ করতে পছন্দ করে। কেউ আবার রাতে ঘুমিয়ে ভোরবেলায় কাজ শুরু করতে ভালোবাসে। কেউ নিজের চিন্তা ও পরিকল্পনাকে জাগ্রত রাখতে পারে। কেউ আবার একটা কাজ বেশিক্ষণ করতে পারে না। বহু রকমের মানুষ আছে এই দুনিয়ায়। তবে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা পিক আওয়ার থাকে, ভালো লাগার একটা সময়সীমা থাকে, যে সময়গুলোতে আমরা বেশ সতেজ আর প্রফুল্ল থাকি;

নিজের মাঝে অপরিমেয় শক্তি আর প্রাণচাঞ্চল্যের স্ফুরণ দেখতে পাই। অন্য সময় হয়তো আমরা তেমন একটা চাঞ্চল্য অনুভব করি না। তাই আমাদের উচিত এই সময়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা যেন নিজের পরিকল্পনা আর চিন্তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেগুলো ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়।

দিনের কোন সময়টা আপনার জন্য মোক্ষম সময়, তা জানতে পারাটা পরিকল্পনা ও লক্ষ্যপূরণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। কারণ আপনি যখন মোক্ষম সময়টা জানবেন, তখন ঐ সময়টুকুতে নিজের সবটুকু শ্রম আর মনোযোগ ঢেলে দিন। যে মানুষটা নিজের পিক আওয়ার কোনটা তা-ই জানে না, তার জন্য লক্ষ্যে পৌঁছনো বেশ কঠিন। ঐ সময়টা তাকে সবচেয়ে সহজ পথ ধরে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সহায়তা করবে।

আমাদের কারো পিক আওয়ার তথা মোক্ষম সময় ফজর থেকে যুহর পর্যন্ত সময়টা। এই সময়ে তারা বেশ সতেজ অনুভব করে, একাগ্র থাকে কাজের প্রতি। আরেকজন এই সময়টাতে কিছুই করতে পারে না। ঘুমিয়ে কাটাতে পছন্দ করে অথবা অপ্রয়োজনীয় কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মাথাটা কাজে লাগাতে পারে না কোনোভাবে। আমাদের কারো কারো পিক আওয়ার শুরু হয় যুহরের পর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। আবার কারো অন্য কোনো সময়। এভাবে মানুষ যদি নিজের পিক আওয়ারটা নির্ণয় করতে পারে, তাহলে তার লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী কাজ করতে সমর্থ হবে। তারপর তার চিন্তা, অনুভূতি ও শক্তি বিনিয়োগ করতে পারবে, লক্ষ্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে।

একজন মানুষ তার মোক্ষম সময়ে অন্যসব কাজ করা থেকে বিরত থাকবে, এটাই বুদ্ধিমত্তার দাবি। দৈনন্দিন কাজকর্ম এই সময়ের জন্য না। সবার সাথে আলাপচারিতা, দেখা-সাক্ষাৎ, সামাজিকতা—এই কাজগুলো এ সময়ের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। যেকোনো বাধা-বিপত্তি বা বিক্ষিপ্ততাকে এই সময় থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে যেন একটি মুহূর্তও নষ্ট না হয়।

সেই বিশেষ সময়ের তিনটা ঘণ্টা আপনার পরিকল্পনা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের পেছনে ব্যয় করলে আপনি এমন স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন যা আপনি কোনোদিন কল্পনাও করেননি। বিশেষ করে কেউ যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের শিখিয়ে দেওয়া 'অল্প হলেও নিয়মিত'—এই নীতি অনুসরণ করে, তিন ঘণ্টা ধরে নিজের মনপ্রাণ সঁপে দেয়, তাহলে এত বেশি কাজ হয়ে যাবে যা চিন্তাও করা যায় না।

চিন্তার খোরাক

পিক আওয়ারের কয়েক ঘণ্টা বেছে নিতে পারেন নিজের চিন্তা আর পরিকল্পনার জন্য। সময়টাকে ধরে রাখুন, যেন তা চোরাবালির অতল গহ্বরে হারিয়ে না যায়। অন্য কোনো কাজ বা দায়িত্বকে সে সময়ে ঢুকতে দেবেন না, এতে মন প্রশান্ত থাকবে। একসময় আপনার মন সেই কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, আর কঠিন লক্ষ্য অর্জন এবং আপনার মাঝের দূরত্ব কমতে থাকবে দ্রুত বেগে।

বিশ্রাম সাফল্যের সোপান

মানুষজন যুগ যুগ ধরে 'অতিরিক্ত পরিশ্রম'-এর নীতি অবলম্বন করে এসেছে। অর্থাৎ আপনি যত কায়িক পরিশ্রম বাড়াবেন, তত বেশি সফলতা অর্জন করবেন। এ বিষয়টা যদিও গুরুত্বের দাবিদার, তবু আগের মতো এর কার্যকারিতা এখন আর নেই। অর্থাৎ, কায়িক শ্রম বেশি দিলেই যে আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, এমন নয়। কঠোর পরিশ্রম যেমন জরুরি, তেমনি নিয়মিত বিশ্রাম নেওয়াটাও অপরিহার্য। মাত্রাতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম আপনার সফলতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ এই সাফল্য এক সময় কোয়ালিটি বা গুণগত মানকে ছাড়িয়ে কোয়ান্টিটি বা পরিমাণের দিকে ঝুঁকে যাবে। আর সেই পরিমাণটা আসবে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা কতটুকু ধারালো আর কতটুকু ভোঁতা তার ওপর ভিত্তি করে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে সেটা এত দুর্বল হয়ে পড়বে যে, কাজ হবে নিষ্প্রাণ।

জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বাদ দিয়ে তবেই একজন মানুষ তার লক্ষ্যের পেছনে দিনরাত শ্রম দিতে পারে। সেসব গুরুদায়িত্ব পালন করতে পরিশ্রম পরিমিত হওয়া চাই। নয়তো এক সময় সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে পাপের অনুভূতি আচ্ছন্ন করে বসবে। ফলে ব্যক্তির স্বাস্থ্য, পারিবারিক জীবন, ঈমানি শক্তি কিংবা বুদ্ধিমত্তা—সব কিছুতে ভাঙন ধরে। দিনে দিনে তার সতেজতা কমে যায়।

প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে আমরা চিন্তা আর বুদ্ধি দিয়ে যত কিছু অর্জন করতে পারি তা কায়িক পরিশ্রমের চেয়ে বহুগুণ কার্যকর। আপনি ইতঃপূর্বে ৮০/২০ নিয়মটা জেনেছেন। অর্থাৎ ২০ ভাগ কাজ করে আপনি ৮০ ভাগ অর্জন করতে পারবেন।

সাধারণত একজন মানুষের দিনে ৮ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। জীবনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হওয়ার আগে আপনাকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি যখন কর্মমুখর জীবনে প্রবেশ করবেন তখন যেন আপনার সামগ্রিক প্রস্তুতি থাকে। আপনি যেন তখন অভিনব সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হন। আমরা কোয়ান্টিটি চাই না, কোয়ালিটি চাই। আপনার কাছে অল্প সময় সজীব, প্রাণবন্ত ও কার্যকর উপস্থিতি চাই। আপনার জীবন থেকে বেশি সময় চাই না। আপনাকে ক্লান্ত ও দুর্বল করে দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই।

কুরআন-সুন্নাহ পড়লে দেখবেন এমন বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানুষ যেন নিজেকে কষ্ট না দেয়, তার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে। সে যেন সহজ-সরল, স্বাভাবিকভাবে তার কাজকর্ম আর ইবাদত করতে পারে। দিনশেষে যাতে একঘেয়েমি তাকে পেয়ে না বসে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> *আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।*[১]

একবার আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এক নারীর অধিক পরিমাণ সালাত আদায়ের প্রশংসা করলেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'থামো! তোমাদের উচিত ততটুকু আমল করা যতটুকুর সামর্থ্য আছে। আল্লাহ ততক্ষণ বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত হও।'[২]

একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম শুনতে পেলেন, তিনজন লোক এসে কিছু শপথ করে গেছে। একজন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সারারাত সালাত আদায় করবে, কখনো ঘুমাবে না। আরেকজন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনোদিনও বিয়ে করবে না। তৃতীয়জন সারা বছর সিয়াম পালন করবে। তখন তিনি বললেন—

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫

[২] *সহিহ বুখারি* : ৪৩

'তোমাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি। কিন্তু আমি সিয়াম পালন করি, আবার কখনো ছেড়ে দিই। সালাত আদায় করি, আবার কখনো ঘুমিয়ে থাকি। আমি নারীদের বিয়েও করি। যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয় সে আমার দলভুক্ত নয়।'[১]

'যারা বাড়াবাড়ি করেছে, তারা ধ্বংস হয়েছে।'—এই কথাটি তিনি তিনবার বলেছিলেন।[২]

হাদিস থেকে জানা যায়—

'এই দ্বীন সহজ। যে এই দ্বীনকে কঠিন করবে, দ্বীন তাকে পরাভূত করবে। তাই তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, সুসংবাদ গ্রহণ করো আর কাছাকাছি চলার চেষ্টা করো। পাশাপাশি সকাল-সন্ধ্যা আর রাত্রিবেলা থেকে কিছু ফায়দা নিয়ে নাও।'[৩]

যে এ বিষয়টা বুঝতে পারবে তার স্বপ্ন পূরণ হবে, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে, যা অর্জন করতে চায় তা পারবে।

চিন্তার খোরাক

অসুস্থ ও ভগ্ন শরীর নিয়ে সফলতা অর্জনের দরকার নেই। দুর্গম পথটাকে উপভোগ করেও আমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পারি।

ছুড়ে ফেলুন বিশৃঙ্খলা

একাগ্র হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী উপায় হলো বিশৃঙ্খলাকে ছুড়ে ফেলা। আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি যাকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগরের ঢেউয়ের সাথে তুলনা করা যায়, যে তীরে দাঁড়িয়ে থাকলে যেকোনো সময়ে ডুবে যেতে পারেন, এজন্য সমুদ্রে নামার দরকার পড়বে না। এ সময়টাতে আপনার হৃদয়

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৫০৬৩

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৬০৮

[৩] *সহিহ বুখারি* : ৩৯

নানারকম চিন্তাভাবনায় ভরপুর হয়ে যেতে পারে। আপনি স্থির হয়ে কোনো কিছু ভাবার মতো সময়ও পাবেন না। কারণ বাস্তবে বিক্ষিপ্ততার অনেক উপকরণ চারপাশে আছে।

রাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ একবার বিশৃঙ্খলা ছুড়ে ফেলার বিষয়টাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক অবগাহন। যেমন : কোনো মানুষ যদি ইতিহাস নিয়ে লিখতে চায়, তাহলে তাকে ইতিহাসের সব বই পড়তে হবে। ব্যাপক সময় নিয়ে ইতিহাসে এমন একটা ডুব দেবে যে, তার রক্তে ইতিহাস ঢুকে পড়বে। সেসব বিক্ষিপ্ততা থেকে সে মুক্তি পাবে, যেগুলো তার চিন্তায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। একইভাবে যে লোকটা কবিতা, গদ্য কিংবা সিরাত লিখতে ইচ্ছুক, তার উচিত আশপাশের সব কিছুর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সাংস্কৃতিক অবগাহন করা; যাতে তার চিন্তা ও পরিকল্পনার জন্য মনটা একনিষ্ঠ হয়। পরবর্তীতে সে তার পরিকল্পিত চিন্তায় মনোযোগ দিতে পারে।

আপনি যদি এই বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে চান, তাহলে এমন কোনো লোকের কথা কল্পনা করুন, যে কোনো চিন্তায় গভীরভাবে ডুব দিয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বাস্তব জগতে ফিরে আসার আগে সে তা শেষ করেই আসবে। কিন্তু সে লক্ষ করে সারা বিশ্বের সর্বত্র হত্যা, ভাঙচুর এবং বিশৃঙ্খলা। বিভিন্ন রকমের খেলাধুলা ও বিনোদনে ছেয়ে গেছে সব কিছু। এদিক-ওদিক থেকে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে তার ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব, প্রোগ্রাম এবং কাজ এসে চেপে বসেছে। তারপরও কি তার কাছ থেকে আপনি ফলপ্রসূ কিছু আশা করতে পারেন? তার চিন্তা-ভাবনায় গভীরতা থাকবে, এটা কি নিছক দিবাস্বপ্ন নয়?

নীরবতা হিরণ্ময়—Silence is golden. আমরা যদি কার্যকরী ও ফলপ্রসূ কোনো চিন্তায় মগ্ন হতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই নির্জনতার কাছে যেতে হবে, নীরব পরিবেশ বেছে নিতে হবে। চিন্তার ক্ষেত্রে সব রকম বিক্ষিপ্ততা থেকে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের চিন্তা-পরিকল্পনা-ভাবনায় অভিনবত্ব এনে সম্ভাবনাময় কাজ করতে চাইলে এই পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। আমি বলছি না, মানুষজন ছেড়ে বনবাসে যেতে। বরং প্রয়োজনে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং অনর্থক সময় অপচয়কারী লোকদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাই একান্তকাম্য।

চিন্তার খোরাক

কিছু সময়ের জন্য আপনার মোবাইলটা রেখে পরীক্ষা করে দেখুন। মোবাইলটা বন্ধ করে বিক্ষিপ্ততা থেকে মুক্ত হোন। এরপর পুরো সময়টা কুরআন পড়া, বই পড়া কিংবা কোনো লেকচার শুনে ব্যয় করুন। দেখবেন আপনার জীবন গড়ার মতো অঢেল সময় আছে, যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।

আজকের কাজগুলো আজই করে ফেলুন

আপনার চিন্তা-চেতনা আর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শত্রু হলো কাজ জমিয়ে রাখা। মনোযোগ নামক অভ্যাসটিকে ধ্বংস করার সব থেকে সহজ উপায় হলো এই মুলতবি রাখার মানসিকতা।

আমরা প্রায়ই ভাবি, অমুক কাজটা কাল থেকে শুরু করব। এখনো হাতে অনেক সময় আছে! এই রকম চিন্তা এলেই তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। এই অভ্যাসটিকে বড় হতে দেবেন না; তা আপনি যেমন পরিস্থিতি বা সমস্যারই মুখোমুখি হোন না কেন।

যতই বাধা-বিঘ্ন আসুক না কেন, হাল ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতা রাখা যাবে না। আপনার পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করুন। আপনি দৈনিক যে প্রায়োরিটি লিস্ট ঠিক করেছেন তা থেকে একচুলও নড়বেন না। যদি অন্যকোনো কাজ একান্তই জরুরি হয়ে পড়ে এবং কোনোভাবে ঠেকানো সম্ভব না হয়, কিংবা স্থগিত রাখাও না যায়; তাহলেও কৌশলে কাজ সারতে হবে। আপনার লক্ষ্য থেকে যতখানি সম্ভব অল্প পরিমাণে হলেও কাজ করতে হবে, যাতে কোনোভাবে আপনার দিনটা একেবারে বিফলে না যায়। এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েই তো ইমাম শাওকানি বলেছেন, 'দুয়েক লাইন হলেও লিখি।'

আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, পরিকল্পনা নিয়ে থেমে যাওয়াটা মারাত্মক ক্ষতিকর। বড় মানুষদের কাজ কখনো এমন হতে পারে না। নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতাটাই সাফল্যের পূর্বশর্ত। আপনার জীবনে উন্নতির সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না, সাবধান!

আখিরাতে সফলতা অর্জনের কত সুযোগ যে এভাবে নষ্ট হয়ে গেছে, আর দুনিয়ার সুযোগ তো বাদই দিলাম। কুরআনে আছে, 'তোমরা তোমাদের রবের

ক্ষমা লাভের প্রয়াসে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও।'[১] এসব কিছু ইতিবাচক কাজের দিকে উদ্বুদ্ধ করে বলা, জীবনের সময়টা অনর্থক নষ্ট না করার দিকে আগ্রহী করে তোলার জন্য বলা।

বুখারিতে উকবা ইবনু হারিসের বর্ণিত হাদিসে আছে, আমি মদিনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে আসরের সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষ হলে তিনি সালাম ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এরপর মানুষের কাঁধ ডিঙিয়ে তার কোনো এক স্ত্রীর ঘরে চলে গেলেন। লোকজন নবিজির এমন তাড়াহুড়ো দেখে বেশ অবাক হলো। পরে তিনি ফিরে এসে সবাইকে বললেন, 'আমার মনে পড়ল ঘরে একটি সোনা কিংবা রুপার টুকরো রয়ে গেছে। আমার ভয় হচ্ছিল, না-জানি কাল হাশরের ময়দানে এর জন্য আমার কত কঠিন হিসেব নেওয়া হবে। তাই সালাত শেষ করে তাড়াতাড়ি সেগুলো বিলিয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়ে এলাম।'[২]

যদি কারো কাজের প্রতি আগ্রহ না থাকে, তার কাছে যদি এ কাজের গুরুত্বই না থাকে কিংবা কাজটা যে দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে সেই বোধ জাগ্রত না হয়, তখনই কাজ ফেলে রাখার প্রবণতা চলে আসে। সে মূলত কাজটা করতেই চায় না। এ সমস্যাটি দূর করার জন্য সে তার মনমতো আনন্দদায়ক কোনো পরিকল্পনা হাতে নিতে পারে।

কাজ ফেলে রাখার মানসিকতা আসার আরেকটা কারণ, লক্ষ্যের মাত্রা বড় হওয়া। এটা ব্যক্তিকে চাপের মুখে ফেলে দেয়। সে তখন দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে।

কাজ ফেলে রাখার আরও কারণ হলো, লিখে রাখা বিষয়টা একজন মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে পরিণত না হওয়া। অর্থাৎ সে যদি দিনের মাঝে এটার জন্য সময় নির্ধারণ না করে, তাহলে তার পেছানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

একজন মানুষের উচিত শুরু থেকেই তার চিন্তা আর পরিকল্পনাকে গুরুত্ব সহকারে দেখা। এরপর সে তার সাধ্যের মাঝে যেসব চিন্তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলো লিখে রাখবে। কতটুকু সময়ের মধ্যে সেগুলো সে শেষ করতে চায় এটাও লিখতে

---

[১] সুরা হাদিদ, আয়াত : ২১

[২] *সহিহ বুখারি* : ১২২১

হবে। এই তিনটা জিনিস ঠিক থাকলে আর কোনো কিছু তার পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। অন্য কোনো ব্যাপার জীবনে যত প্রভাব বিস্তারই করুক না কেন, সেটা তার লক্ষ্য অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করতে সক্ষম হবে না।

মনে রাখবেন, কাজ পিছিয়ে রাখা কিংবা আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখা নিজের ওপর জুলুম করা, নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে পুড়িয়ে ফেলা এবং সক্ষমতাকে অকার্যকর করার নামান্তর। এটা নিয়মিত করলে আপনার কর্মক্ষমতা যেমন নষ্ট হবে, তেমন আপনার বিশ্রামের মুহূর্তও ফুরিয়ে যাবে। আপনি যখন রাতে ঘুমাতে যাবেন তখন আপনার মাঝে দুশ্চিন্তা এসে ভর করবে। আপনি কেন কাজ শেষ করলেন না, সে জন্য হতাশা ঘিরে ধরবে আপনাকে। অবশেষে আপনি আবিষ্কার করবেন, সব কিছু আপনি হারিয়ে ফেলেছেন।

এই সমস্যার সমাধান হলো, আপনি যে কাজগুলো প্রায়োরিটি লিস্টে রেখেছেন সেগুলোর জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ রাখবেন, ঐ সময়টাতে সেই কাজগুলো করে ফেলবেন। তারপর কিছুক্ষণের জন্য থেমে আপনার পছন্দনীয় কোনো একটা কাজে জড়াবেন। কিছুক্ষণ সেটায় ব্যস্ত থেকে আবার ফিরে আসবেন, যাতে করে প্রত্যেকবার আপনি প্রায়োরিটি লিস্টে থাকা কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারেন।

এই পদ্ধতির সবচেয়ে ভালো দিক হলো এতে করে আপনার জন্য পথটা সহজ হয়ে যাবে। আপনার মাঝে ইতিবাচক অনুভূতি জন্ম নেবে। আপনি নিজেই নিজের কাজের অগ্রগতি অনুভব করতে পারবেন। ছোট ছোট টার্গেটগুলো পূরণ হবে। দিনে দিনে কাজ মুলতবি রাখার বদ অভ্যাসও দূর হয়ে যাবে।

কিছু মানুষ জানে, তার দায়িত্ব হলো প্রতিদিন এক পারা কুরআন পড়া। এই দায়িত্বটা তাকে চাপে ফেলে দেয়। তাই প্রতিবারই সে এই কাজ ফেলে রাখে। ছোটখাটো কিছু কাজ করে নিজেকে প্রবোধ দেয়। সেগুলো তাকে ক্ষণিকের জন্য আত্মতুষ্টি হয়তো এনে দেয়, কিন্তু দিনশেষে সে নিরাশ হয়ে দেখে—যে বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে সে অগ্রসর হয়েছিল তা সে পূরণ করতে পারেনি।

তাহলে এর সমাধান কী? সমাধান হলো, সে তার কাজটাকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করবে। একবার ৫ পৃষ্ঠা পড়বে, যেটার জন্য হয়তো ৫ মিনিট লাগবে। দ্বিতীয়বার আর তৃতীয়বারও এ রকম করবে। এভাবে একদিন সে দেখতে পাবে খুব বড় সময় কাজে ডুবে না থেকেও সে তার লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে। হাতে পড়ে

থাকা এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো তাকে তাৎক্ষণিক আনন্দ দেয়, সেগুলোতে সে আর ব্যস্ত হবে না। যেমন: সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম, বন্ধুর সাথে গল্পগুজব অথবা কোনো কাজ করতে ঘরের বাইরে যাওয়া—এগুলো সে এড়িয়ে যেতে পারবে খুব সহজেই।

চিন্তার খোরাক

আপনি প্রতিদিন কেন আপনার প্রায়োরিটি লিস্টে থাকা কাজগুলো শেষ করতে পারেন না তা নিয়ে ভাবুন। আপনার কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করুন। অথবা কাজের সাথে এমন একটা অনুভূতি মিশিয়ে ফেলুন যা আপনাকে আনন্দ দেবে। কিংবা কাজটার সমাপ্তি কতটা সুন্দর হবে তা কল্পনা করুন। হতে পারে সেটার জন্য নিজের ঘরে কোনো স্টিকি নোট লাগিয়ে রাখলেন কিংবা চার্ট টানিয়ে রাখলেন অথবা শেষ করার পর নিজেকে পুরস্কৃত করলেন। দেখবেন, কত সহজে কাজগুলো শেষ হয়ে যাবে!

কাজগুলো সব সহজ করুন

আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনার মুখে যে বিষয়গুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সফলতা অর্জনে বাদ সাধে তার একটা হলো জটিলতা। হোক সেটা লক্ষ্যের ভারে জর্জরিত হওয়ার জটিলতা কিংবা লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে নানারকমের বাধা-বিপত্তি।

এই জটিলতা পরিহারের একটিই উপায়। তা হলো আপনার লক্ষ্যকে সহজ করে নিন, হাতের মুঠোয় নিয়ে আসুন।

এক লোক কুরআন মুখস্থ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঠিক করলেন, প্রতিদিন ২/৩ পৃষ্ঠা করে মুখস্থ করবেন। অথচ দেখা গেল, বাস্তব জীবনে তিনি চরম ব্যস্ত একজন মানুষ। হাজারো কাজের বোঝা চেপে আছে তার কাঁধে। এত সব ব্যস্ততা কাটিয়ে উঠে তার পক্ষে কি কুরআন মুখস্থ করার কাজে নিয়মিত সময় দেওয়া সত্যিই সম্ভব? উল্টো তার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কাই তো বেশি, তাই না? দেখা যাবে, তার কাঁধে দায়িত্বের পর দায়িত্ব এসে হাজির। কখনো কখনো অন্তহীন ব্যর্থতা তাকে পেয়ে বসবে। শেষ পর্যন্ত তার ওপর চেপে বসা কাজের পরিমাণ এত বেশি হয়ে যাবে যে, সে পুষিয়ে নিতে পারবে না। তার মাঝে এক ধরনের অবসাদ কাজ করবে। হতাশা ঘিরে ধরবে। অবশেষে একটা পর্যায়ে এসে

সে পুরো লক্ষ্যটাই বাদ দিয়ে অন্য কোনো পথ খুঁজে নেবে। এদের অনেকে ২০ বছর ধরে কুরআন মুখস্থ করবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে অথচ তা বাস্তবে অর্জন করতে পারছে না।

অন্যদিকে এমন মানুষও আছেন, যিনি তার দায়িত্বটা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। হয়তো কখনো কখনো তার কাজ ছুটে যায়। কিন্তু তার পরিকল্পনায় ফ্লেক্সিবিলিটি বা নমনীয়তা থাকায় অসুবিধা হয় না। দেখা যায়, ছুটির দুই দিনে তিনি ছুটে যাওয়া কাজ সম্পন্ন করে আবার পুরোনো পড়া রিভিশন করেন। এভাবে তার একদিনের পড়াও পিছিয়ে যায় না। যদি কখনো নিয়মিত পড়ায় ছেদ পড়ে, তবু তিনি সেটা পরিকল্পনা অনুসারে গুছিয়ে নিতে পারেন।

একজন মানুষ পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিদিন ৫০ পৃষ্ঠার বেশি পড়েন। আরেকজন প্রথম দিন ৫ পৃষ্ঠা দিয়ে শুরু করেন, এরপর ধাপে ধাপে বাড়াতে থাকেন। দেখা যায়, প্রথম জন এক সপ্তাহ পার হওয়ার পরই ক্লান্ত অনুভব করছেন। তার কাঁধে এমন সব দায়-দায়িত্ব এসে হাজির হচ্ছে, যার কারণে তিনি প্রতিদিনকার টার্গেট পূরণ করতে পারছেন না। এভাবে একের পর এক কাজের ভার চেপে বসলে দিনশেষে তিনি পড়ার অভ্যাসই ছেড়ে দেবেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় জন ঠিকই ধীরে ধীরে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবেন।

আমি যদি আপনাকে বলি, যারাই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আটঘাট বেঁধে নেমেছে, তারা সবাই এক মাসের মাথায় সেসব পরিকল্পনা জলাঞ্জলিও দিয়েছে; তবু আমার কথা অত্যুক্তি শোনাবে না।

মনোযোগের অভ্যাস গড়তে হলে যে জিনিসটা আপনাকে শিখতে হবে তা হলো আপনার লক্ষ্যকে সম্ভাবনাময় এবং বাস্তবসম্মত করে নেবেন। যদি অতিরিক্ত সময় পান, তাহলে অতিরিক্ত কিছু অর্জন করে নেবেন যা আপনাকে পরবর্তীতে উন্নতির সোপানে পৌঁছে দেবে।

লক্ষ্যকে সহজ করে নেওয়া লক্ষ্য নির্ধারণের একটা মাধ্যমে হতে পারে। আবার জীবনের অন্যান্য দায়িত্ব (ঈমান, আমল, চিন্তা, পরিবার, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য)-এর সাথে তুলনা করেও করা যেতে পারে। কারণ একের পর এক চেপে বসা টার্গেট মানুষের মনে ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি করে। দায়িত্ব ছুটে যাওয়ায় দুঃখে ভেঙে পড়ে। শেষমেশ কাজ করাই ছেড়ে দেয়।

চিন্তার খোরাক

জীবনের মতো এত চমৎকার উপহার আর কী হতে পারে! আল্লাহ মানুষের জীবনকে অত্যন্ত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর করে সাজিয়েছেন। বেশি বেশি দায়িত্ব নিয়ে একে যন্ত্রণাক্লিষ্ট করে তুলবেন না। নিজেকে কষ্ট দিয়ে ফেলবেন না। এতে আপনার শান্তি নষ্ট হবে, আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হবেন। সহজ কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিন, যেগুলো সহজে আদায় করতে পারবেন। তারপর অন্যান্য কাজের জন্য নিজের অবসর সময় বেছে নিন।

আশায় আশায় দিন কেটে যায়

জীবনে মনোযোগ অর্জনের অন্যতম সহায়ক বিষয় হলো আশাবাদী হওয়া, রবের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা। সবসময় মনে রাখবেন, আপনার জীবনের পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। আপনি ভবিষ্যতে ব্যতিক্রমী কিছু করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আপনার জন্য মনোযোগ অর্জন করা সম্ভব। এই অভ্যাসের গুণে আপনি লক্ষ্য অর্জনও করতে পারবেন। তাই ভয়, দুশ্চিন্তা, হতাশা, দুর্ভাবনা সবকিছু ঝেড়ে ফেলুন। এসব বৈশিষ্ট্য আপনার উত্তম গুণাবলিকে মুছে দেবে।

আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আশাবাদী ছিলেন। তিনি জীবনে এত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, এত নির্যাতন-অত্যাচার সয়েছেন, অথচ কখনোই হতাশ হননি, বিরক্তি প্রকাশ করেননি। তিনি বলেছেন, 'আমার কাছে ভালো ধারণা পছন্দনীয়।' তিনি খারাপ কিছু আশা করা কিংবা কোনো কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করতে নিষেধ করতেন। কোনো মানুষ যদি এটা বলত 'লোকে ধ্বংস হয়ে গেছে'—সেটাও তিনি অপছন্দ করতেন।

আপনার উন্নত রুচির প্রমাণ এটাই যে, আপনি সুধারণার ওপর বহাল থাকবেন। এই ধারণা রাখবেন, কোনো মানুষ যদি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং তৌফিকপ্রাপ্ত হওয়ার সকল আলামত নিজের মাঝে জড়ো করতে পারে; তবে সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করবে।

তাই আপনার লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করার পর মনের দেওয়ালে এই নোটিশ ঝুলিয়ে দিন, আপনি ভবিষ্যতে কিছু একটা করতে যাচ্ছেন। আপনি যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চান, সেখানে পৌঁছবেনই; তা যত দীর্ঘ পথই হোক না কেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৩ বছর সংগ্রাম করলেন, তখন অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টে নিপতিত হতে হয়েছে তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় তারই হলো। দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আগে তিনি সারা পৃথিবীর বুকে শান্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আসুন আমরা অসাধারণ সব অভ্যাস দ্বারা নিজেদের জীবন গড়ে তুলি। আমরা আশা রাখি, পথের শেষে আমরা পৌঁছাবই। আল্লাহর সাহায্যে আমরা শেষ নাগাদ পৌঁছে যাই। তাই সফলতা দেরিতে আসছে বলে থেমে যাবেন না। হয়তো একদিন আপনি সামান্য পেছাবেন, কিন্তু দেখা যাবে পরদিনই সাফল্য আপনাকে ঘিরে ধরবে।

চিন্তার খোরাক

হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা করে, আমিও তার ব্যাপারে ঠিক তেমন ধারণাই করি। আমার ব্যাপারে ভালো ধারণা করলে আমি তার জন্য সেরকম। আর খারাপ ধারণা করলে আমিও তার জন্য সেরকম।' আপনার রবের ব্যাপারে ভালো ধারণার নমুনা হলো—আপনি পথে হোঁচট খেলে থেমে যাবেন না। আপনি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহ আপনার আশা পূরণ করবেনই।[১]

বার্তা

একবার এক উপস্থাপকের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন, প্রথমবার যখন আমি উপস্থাপনার জন্য ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলাম, তখন আমাকে বলা হলো, 'আপনার কণ্ঠ ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। আপনার ভাষা আসলে উপস্থাপনার উপযোগী নয়।' তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি ভাষা শিখব। এক বছর সময় নিয়ে শিখলামও। এরপর আবার ইন্টারভিউ দিতে গেলাম। এবার বলা হলো, 'এখনো আপনার অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি।' আমি ফিরে গিয়ে আরেক বছর ভাষা শিক্ষায় লেগে রইলাম। এরপর উপস্থাপক হিসেবে যোগ দিলাম।

আনন্দের বিষয় হলো, সেদিন প্রথম প্রোগ্রামের পর মন্ত্রী নিজে আমাকে ফোন দিয়েছেন। আমি মন্ত্রণালয়ে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম!

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৭৪০৫

অভ্যাসের শত উপকার

বহু মানুষ মনোযোগের গুরুত্ব বোঝেন এবং কোনো কিছু অর্জনের পেছনে এর সীমাহীন অবদান স্বীকার করেন। কিন্তু তাদের বড় সমস্যা হলো প্রতিদিনকার অহেতুক কাজের স্রোত সেগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এর কারণ, তারা বিশ্বাসকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করতে পারেননি।

আপনি যদি কোনো মানুষের দিকে তাকান তাহলে লক্ষ্য করবেন, তার ভালো কিংবা খারাপ পরিণতির পেছনে মূল অবদান এই অভ্যাসেরই।

আপনার আশপাশের কিছু মানুষকে প্রশ্ন করুন, কিতাবুল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক কেমন, তাহলে দেখবেন তাদের বেশিরভাগই অভিযোগের সুরে বলবে, সময়ের অভাবে তারা কুরআন পড়তে পারছে না। অন্যদিকে এমন মানুষও পাবেন যিনি প্রতিনিয়ত কুরআন পড়ছেন এবং তা থেকে উপকৃত হচ্ছেন। তাই তার জীবনে এর প্রভাব সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত। কারণ লোকটা নিজের ওপর কাজটাকে আবশ্যক করে নিয়েছে। এরই মাধ্যমে জীবনের অর্থ সে খুঁজে পেয়েছে।

আবার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে খোঁজ নিতে গেলে দেখবেন অভিযোগের পর অভিযোগ আসছে। আপনার কাছে ভয়াবহ লাগবে। এই দায়িত্ব পালন নিয়ে তারা যে পরিমাণ দুশ্চিন্তার মাঝে থাকে, সেটার বিস্তারিত শুনতে থাকবেন। তথাপি কিছু মানুষ আছেন যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে খুবই যত্নশীল। এর কারণ, তিনি হয়তো সপ্তাহের কোনো একদিন নির্দিষ্ট একটা সময়কে আত্মীয়দের খোঁজ নেওয়ার জন্য আলাদা করে রেখেছেন। এভাবে সাপ্তাহিক অভ্যাস ধরে রেখে তিনি এটাকে স্বাভাবিক করে নিয়েছেন। এসব কিছু প্রমাণ করে, মনোযোগ অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে—মানুষ যা করতে চায় সেটার জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করা।

যে ব্যক্তি সফল হতে চায় তার উচিত তার লক্ষ্যটাকে দৈনিক অভ্যাসে পরিণত করে ফেলা, যা সে কখনো ছেড়ে দেবে না। এতটুকু করতে পারলেই লক্ষ্য অর্জন অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।

মানুষ নিয়মিত যা করে সেটাই তার অভ্যাস। যত সফল মানুষ আছে সবাই তাদের অভ্যাসের তিক্ত গাছের সুমিষ্ট ফল। সেই অভ্যাসগুলোকে চিন্তার মাধ্যমে

ফলপ্রসূ করে তারা লক্ষ্য অর্জন করে নিয়েছে। আর যারা বিফল হয়েছে, তারা খারাপ অভ্যাসের কারণেই হয়েছে। এই খারাপ অভ্যাস তার স্বপ্ন পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হতে পারে বই পড়া। কখনো আমরা সেটা ছেড়ে দেবো না। একই কথা প্রযোজ্য শরীরচর্চার ক্ষেত্রেও। আত্মীয়দের খোঁজ নেওয়ার বিষয়টাও অন্তর্ভুক্ত হবে। টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারাটাও খুব জরুরি। আর সব অভ্যাসের মাঝে সব থেকে দরকারি হলো প্রতিদিন অল্প হলেও কুরআন পড়া। এসব ধরে রাখলে আমরা লক্ষ্য অর্জন করার পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে পারব।

ভালো অভ্যাস আমাদের জীবনকে বদলে দেবে। স্বাভাবিক একটা কাজকে সময়ের পরিক্রমায় বিরাট কাজে রূপান্তর করে দেবে। একই সাথে অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে মানুষকে বারবার ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয় না, অভ্যাসবশত সেটা করা হয়ে যায় প্রতিদিন।

একটা বিষয় মাথায় রাখা দরকার। অভ্যাস গড়ে তুলতে চাইলে, প্রথম দিনগুলোতে কাজ বেশ কঠিন এবং কষ্টকর মনে হতে পারে। কিন্তু কিছুদিন এগুলে দেখা যাবে সেটা আমাদের প্রতিদিনকার কাজে পরিণত হয়েছে।

আপনার সময়ের একটা ছোট অংশ বেছে অভ্যাস ঠিক করে নিন। সেই সময়ে অন্য কোনো দায়িত্ব হাজির হলেও তা দূর করার মানসিকতা তৈরি করতে থাকুন। এতে আপনি সফলতার দিকে এগিয়ে যাবেন। একই কথা প্রযোজ্য এমন প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারে, যেগুলো শুরুতে সামান্য চারাগাছের মতো থাকে, অথচ একটু সময় দিলেই তা পরিণত হতে পারে বিশাল মহিরুহে।

চিন্তার খোরাক

আপনি ঘুমানোর আগে যে ২০ মিনিট সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে কাটান, সেই ২০ মিনিট যদি ভালো কোনো বই পড়েন, কুরআন পড়েন কিংবা কুরআনের দুয়েকটি আয়াত মুখস্থ করেন, তাহলে বছর শেষে কতখানি কাজ হবে ভেবে দেখেছেন কখনো? আপনি এত বেশি কাজ করে ফেলবেন, যা আপনি কখনো ভাবতেও পারেননি। এমনকি নিজের চলমান অগ্রগতি দেখেই আপনি নিজেই বিস্মিত হয়ে যাবেন!

ধনুকভাঙা পণ

একজন পিএইচডির শিক্ষার্থী কমপক্ষে চার বছর একই বিষয়ে গবেষণা করে, সে একই সাথে বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে এগোয় না। বরং একই প্রজেক্টের জন্য সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সময় ব্যয় করে, সেটাই হয়ে দাঁড়ায় তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। সুপারভাইজারের হাজারো বিরোধিতা, অপমান, উদাসীনতা তার কাজ থামিয়ে দিতে পারে না। কারণ সে স্নাতকের পর যে সংকল্প নিয়ে এগোয় তাতে দৃঢ় থাকতে বদ্ধপরিকর হয়ে লড়ে যায়।

যদি কিছু অর্জন করতে চান, সফল হতে চান কিংবা কোনো কিছুর শেষ দেখতে চান, তাহলে একটা পরিকল্পনায় নিজেকে সীমিত রাখুন। সেটা অতিক্রম করতে যাবেন না। আপনার শক্তি, সক্ষমতা আর সম্ভাবনাকে একমাত্র উদ্দেশ্যের দিকে নিবদ্ধ করুন। সেটিই হোক আপনার প্রথম আর শেষ চিন্তা। আপনার জীবনের একমাত্র পরিকল্পনা হোক সেটি, অন্য কিছু নয়। আপনি অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হতে যাবেন না। আপনার দিনটা যেন আর কিছু টেনে নিয়ে যেতে না পারে। আপনার পথে যে বাধাই আসুক সেটার সামনে আপনি মাথা নোয়াবেন না, আত্মসমর্পণ করবেন না, থেমে যাবেন না।

আপনি আপনার দুর্বলতাগুলো সমাধান করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না। বরং শক্তিগুলো পর্যবেক্ষণ করুন, পরিকল্পনা সফল করতে সেগুলো কাজে লাগান। জীবনের গল্প রচনা করতে চিন্তা, অনুভূতি আর আত্মাকে নিবিষ্ট করুন। পথের মাঝে নিজেই থেমে গিয়ে পরিস্থিতিকে দোষ দেওয়া বন্ধ করুন, অহেতুক বিরক্তি প্রকাশ করে কোনো লাভ নেই।

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠুন পরিকল্পনাকে মাথায় রেখেই। স্বপ্ন আর চিন্তাকে বাস্তবায়নের অভিপ্রায় নিয়েই দিন শুরু হবে, অন্য কিছু যেন মাথার ভেতর না ঢুকে যায়।

কোনো চিন্তায় এককভাবে নিবিষ্ট হওয়া দ্রুত ফলাফল বয়ে আনে। একটা মাত্র পরিকল্পনায় নিবদ্ধ হলে প্রতিদিন আপনার স্বপ্নের সীমানা একটু একটু করে কমতে থাকে, সাফল্যের রেখা একটু একটু করে কাছে আসতে থাকে। দিনশেষে আপনি হয়ে উঠবেন গল্পের নায়ক।

আপনাকে আহ্বান করছি! ঘুম থেকে উঠলে আপনার লক্ষ্য যেন হয় কেবল আপনার পরিকল্পনা, আপনার গল্পের প্লট নির্মাণ। নিরন্তর পা চালান, পথটা সুগম করুন। স্বপ্নের দিকে ছুটে চলুন। আশপাশের সবকটা পথ ছেড়ে দিন, সেগুলো দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন। যে পথে চলেছেন, সেই ঊষর মরুময় পথ কালের আবর্তে বসন্তে পরিণত হবে। আপনি যে মানুষগুলোকে দূর থেকে এতদিন দেখে চলেছেন, একদিন তাদের কাছাকাছি যেতে পারবেন; লক্ষ্যে পৌঁছানোর কারণে তারা আপনাকে স্বীকৃতি দেবে, যদিও তাদের স্বীকৃতি পেতে আপনি কোনো কাজ করেননি।

একেই বলে আগ্রহ-উদ্দীপনার টান। দুনিয়ার যত বাধা-বিপত্তি আসুক, কখনো আপনি এটা ছেড়ে যাবেন না।

পানি আমাদের শেখায় কীভাবে ফোঁটা ফোঁটা করে পতিত হয়েও একটা শক্ত পাথরের বুকে গর্ত করা যায়। দিন যতই গড়িয়ে যাক, আমরা যেন নির্দিষ্ট স্থানে ফোঁটার মতো করে পতিত হওয়া বন্ধ না করি। তাই কখনো বিক্ষিপ্ত হবেন না।

আপনি যখন নিজের পরিকল্পনায় অগ্রসর হবেন, লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে শিখবেন, সেটার জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন, পথ ছেড়ে যাবেন না; তখন কোনো একদিন সারাবিশ্ব আপনাকে ঘিরে বসবে আপনার অভিনব অর্জনের কাহিনি শোনার জন্য, যদিও বা তাদের অবাক করা আপনার উদ্দেশ্য ছিল না। তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, 'কীভাবে আপনি পাহাড়ে উঠলেন? কীভাবে এত পথ পাড়ি দিলেন? কীভাবে নিজেকে এতদূর নিয়ে যেতে পারলেন যেখানে যাওয়ার আগে বহু লোক হতাশ হয়ে মারা পড়ে?'

আমাদের যুগে জীবনের একটা আরাধ্য বিষয় হলো একাগ্রতা ধরে রাখা। বিক্ষিপ্ততার এ ঘোর অন্ধকারে সফলতার মশাল হলো মনোযোগ। দিনশেষে মানুষ জীবনের মিনার হিসেবে যে জিনিসটাকে নিতে পারে সেটা হলো মনঃসংযোগ। আপনি যদি অন্যদের জন্য আদর্শ হতে চান, সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে চান; তাহলে বাকি জীবনটা 'মনোযোগ' তৈরিতে কাটিয়ে দিন।

চিন্তার খোরাক

সিবাওয়াই ছিলেন আরবি ব্যকরণশাস্ত্রের ইমাম। ইবনুল মুকাফফা বক্তৃতার সর্দার। আবু তাম্মাম কবিদের রাজা। তারা সবাই ৩৬ বছরের আগে মারা গিয়েছিলেন।

কিন্তু আজও তাদের স্মৃতি অমলিন। তারা তাদের লক্ষ্য জীবনের শুরুতেই নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন, তাই অল্প বয়সে সেটার জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

দায়িত্ব নিতে শিখুন

অভিনবত্ব বা বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার অর্থ হলো আপনিই হবেন পতাকাবাহী কিংবা আলোকবর্তিকা বহনকারী।

সফল মানুষরা পথের বাধা, পরিবেশ, সমস্যা-সংকটকে বড় করে দেখেন না। তারা এটাই বিশ্বাস করে, প্রতিটি আনন্দের পেছনে একজন মানুষের ত্যাগের গল্প লুকিয়ে থাকে। প্রতিটি জীবন্ত চিন্তার পেছনে নিয়োজিত থাকেন একজন পথিকৃৎ।

আপনি বিশ্বাস রাখুন, জীবন একটা সাহসী অভিযান ছাড়া কিছুই নয়। আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কতটা কঠিন, চিন্তা কতটা জটিল, বাস্তবতা কতটা সংকটপূর্ণ; সেটা কাউকে বলতে যাবেন না। বরং আপনি আপনার জীবনে কী কী অর্জন করেছেন তা আমাদের শোনাতে পারেন। আরো শোনাতে পারেন, আপনি কোন দৃঢ়তার শক্তিতে পথের সংকটকে তাড়াতে পেরেছেন। শেষ পর্যন্ত কীভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় পাহাড়ও আপনার কাছে হার মেনেছে, সমতল ভূমি আপনার পায়ের নিচে ঠাঁই পেয়েছে, মরুভূমি পরিণত হয়েছে সবুজ-শ্যামল বাগিচায়!

প্রত্যেকের এই বিশ্বাসটি রাখতেই হবে যে, উপকারী চিন্তা, বড় কিছু করার পরিকল্পনা—এগুলোর সামনে বিশালাকার পাথর এসে বাধা দেবে, জমিন আঁধারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, সাহায্য করার মতো লোকের সংখ্যা কমে আসবে। আপনি যদি দেখেন কিছু মানুষ সেই ভার বইছে, দায়িত্ব পালন করছে, যথাযথভাবে আদায় করছে; তাহলে সহজেই পাথর ভেঙে পড়বে, জমিনে আলো ছড়িয়ে পড়বে, পথে সঙ্গী-সাথি বেড়ে যাবে।

জলজ্যান্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কখনো একজন ভীতু কিংবা দ্বিধাগ্রস্ত লোকের দ্বারা সম্ভব নয়। বরং প্রয়োজন একজন দুঃসাহসী মানুষ যিনি এই চিন্তাকে বাস্তবায়নের জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করতে সদাপ্রস্তুত। দুনিয়া ছেড়ে আসার আগে তিনি সফলতার গল্প লিখে তবেই বিদায় নেবেন।

রিসালাতের প্রথম যুগে কুরাইশ বংশের কাফিররা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেক লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছিল তার চিন্তা ও পরিকল্পনা থেকে সরে আসার জন্য। অনেক দর কষাকষি করেছিল। কিন্তু তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা কি আকাশের ঐ সূর্যটা দেখতে পাচ্ছ?' তারা বলেছিল, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।' তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা ঐ সূর্য থেকে আমাকে খানিকটা আগুন এনে দিলেও তার বদলে এ পথ থেকে সরে দাঁড়াতে পারব না।'[১]

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের ব্যাপারে বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! ওরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যাকাত হিসেবে যা দিত, তার থেকে একটা বকরি ছানাও যদি কম দিতে চায়, তাহলে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব।'[২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি বলতেন, 'আল্লাহ! আপনি দুই উমারের[৩] কোনো একজনের মাধ্যমে ইসলামকে সম্মানিত করুন।' যেদিন উমার নতুন জীবনে এলেন, মুসলিমরা কাবা-চত্বরে সালাত আদায় করল। তাদের ইতিহাস রূপ নিলো সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ ইতিহাসে। ইসলামের দিকে ঘুরে গেল দুনিয়ার চাকা।[৪]

হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হওয়ার পর নবিজি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'হামযার জন্য কাঁদার কেউ নেই!'[৫]

উহুদের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'কে আমার এই তরবারি নিয়ে এটার হক আদায় করবে?' আবু দুজানা সেদিন দাঁড়িয়ে

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, পৃষ্ঠা : ১৫৫; *দালাইলুন নুবুওয়াহ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১৮৭; *আস-সিলসিলাতুস সাহিহাহ*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১৪৭

[২] *সহিহ বুখারি* : ৭২৮৪

[৩]এখানে দুই উমার বলতে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু' ও 'আমর ইবনু হিশাম'কে বোঝানো হয়েছে। আবু জাহলের আসল নাম আমর ইবনু হিশাম। উল্লেখ্য, আরবিতে 'উমার' ও 'আমর' শব্দ দুটোর মূলধাতু এক হওয়ার কারণে তাদেরকে 'দুই উমার' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

[৪] *মুসনাদু আহমাদ* : ৫৬৯৬; *জামি তিরমিযি* : ৩৬৮১

[৫] *কিতাবুল মাগাযি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩১৬

বলেছিলেন, 'আমি করব, হে আল্লাহর রাসুল!'[১]

একদিন মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনতে পেয়ে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'কিন্তু আমার চাওয়া তো ঘরভর্তি আবু উবাইদার মতো লোক!'[২]

দ্বিধাগ্রস্ত, ভীত কিংবা চিন্তিতদের এ জীবনে কোনো কল্যাণ নেই। প্রতিদিন সকালে যে সূর্য ওঠে, তা রাসুলুল্লাহর মৃত্যুর পরও থেমে যায়নি।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'এমন কোনো রাত নেই যে-রাতে আমি কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম না। কিন্তু এখন আমাকে বিছানায় মারা যেতে হচ্ছে উটের মতো। ভীতুদের চোখ নির্ঘুম থাক!'

চিন্তার খোরাক

নেলসন ম্যান্ডেলা কারাগারে ঢুকে কয়েদিদের বলেন, 'এমন একদিন আসবে, যেদিন আমার পা ঐ সবুজ ঘাসের ওপর হেঁটে বেড়াবে। উত্তপ্ত সূর্যের আগুনমাখা রোদ আমার মাথায় উষ্ণতা ছড়িয়ে দেবে।' তারা লোহার কপাটে বন্দি করে রাখল মহান এই বিপ্লবী নেতাকে।

দীর্ঘ ২৭ বছর পর খোলা হয়েছিল সে দরজা। তিনি হাঁটলেন সবুজ ঘাসের ওপর। তপ্ত রবিকর আবার তার মাথায় উষ্ণ পরশ বুলিয়ে দিলো সীমাহীন মমতায়!

সঙ্গদোষে লোহা ভাসে

সফলতায় সবচেয়ে বড় সহায়তা করতে পারে আপনার ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু। সে আপনার মনে কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি করে দেবে, পরিকল্পনার ভাবনা জাগিয়ে তুলবে, লক্ষ্যপানে মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়তা করবে এবং শেষে সফলতার সীমানায় আপনাকে পৌঁছে দেবে।

অন্যদিকে পতনের সবচেয়ে বড় কারণও সে হতে পারে, সম্ভাবনা আর শক্তিকে বিনষ্ট করে দিতে পারে। জীবনে উপকারী কোনো কাজে মনোনিবেশ প্রদানে বাধার

---

[১] *দালাইলুন নুবুওয়াহ,* খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ২৩২

[২] *মুস্তাদরাকুল হাকিম,* খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ২৯৪

কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এই খারাপ সঙ্গ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটা বেশ চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

'উত্তম সঙ্গী ও খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ হলো আতর-বিক্রেতা ও হাপরে ফুঁ দানকারী ব্যক্তির মতো। আতর-বিক্রেতা তোমাকে সুগন্ধি লাগিয়ে দেবে কিংবা তার পোশাক থেকে তুমি সুগন্ধ পাবে, নতুবা তার থেকে আতর কিনতে হবে। অন্যদিকে হাপরে ফুঁ দানকারী হয় তোমার পোশাক পুড়িয়ে ফেলবে অথবা তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে।'

যে বন্ধু সফল হতে সাহায্য করে, চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়, মনে উৎসাহ জোগায়; তাকেই তো আপনি বাছাই করবেন।

আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু যে এতটা প্রশংসিত হতে পেরেছিলেন, সাহাবিদের মাঝে শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন, তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যের বদৌলতেই। তার সঙ্গ গ্রহণ করে অবশেষে জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য খুলে গিয়েছিল।

আবু তালিব যে বিভ্রান্তির চোরাবালিতে আটকে ছিলেন, সেটাও কেবল সঙ্গীদের প্রভাবেই হয়েছিল।

মনোযোগ আনতে হলে, অভ্যাসটা নিজের মাঝে ধারণ করতে হলে, এমন এক সঙ্গী বাছাই করতে হবে যিনি সুচিন্তাকে জাগ্রত করে দুশ্চিন্তা দূর করেন। যিনি বন্ধুকে ঠেলে দেন কর্মমুখর জীবনের দিকে। যার সাথে পৌঁছানো যায় পথের শেষ প্রান্তে। সাবধান! অকর্মণ্যদের সঙ্গ গ্রহণে বিস্তর ঝুঁকি রয়েছে। তাদের কোনো লক্ষ্য থাকে না। তারা পথেই নিজেদের যোগ্যতাকে বিনষ্ট করে আর দুনিয়ার খেল-তামাশায় মগ্ন হয়ে পড়ে।

সাংবাদিক মুহাম্মাদ হাতহুত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন—

'বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের স্কোর খুব কম ছিল। এক পর্যায়ে সে বাধ্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনাকে চিরতরে বিদায় জানায়। পরে আমেরিকায় একটা স্কলারশিপ পায়। সেখানেও সে একই ভুল করে বসে।

পড়ালেখা চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বার ভুল করার পর একবুক হতাশা নিয়ে নিজ দেশে ফিরে আসে। তার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার এটা সে নিশ্চিত হয়ে যায়। তবু সে কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করে। সেখানে চান্সও পেয়ে যায়। তখন সে আমার সাথে যোগাযোগ করে বলে, 'এটা আমার শেষ সুযোগ, মনে হচ্ছে এবারও আমি ব্যর্থ হব। আপনি প্লিজ আমাকে এমন কোনো উপায় বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি হোঁচট খাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারব। অতীতের সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পাব।'

আমি তাকে বললাম, 'আমি তোমাকে বেশি উপদেশ দিয়ে চাপে ফেলব না। কেবল একটি পথ বাতলে দেবো যা অনুসরণ করলে তোমার কষ্টও হবে না, সময়ও ব্যয় হবে না। কিন্তু তুমি তোমার লক্ষ্যে ঠিকই পৌঁছে যেতে পারবে।' এ বিষয়ে তাকে প্রতিজ্ঞাও করালাম। তারপর বললাম, 'যে বুদ্ধিটা দেবো সেটা খুবই সাধারণ। নতুন কোনো কিছু না। কিন্তু নিয়মিত চালিয়ে যেতে হবে। কাজটা হলো—বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি কেবল মেধাবী ছাত্রদের সাথেই চলবে। খাঁটি বাংলায় যাদেরকে আমরা আঁতেল বলে থাকি, তুমি তাদের সাথে চলাফেরা করবে। ক্লাসের ফাঁকে, খেলাধুলা, ঘোরাঘুরি, আড্ডা দেওয়া, চা-কফি খেতে গিয়ে সবসময় তাদের সাথেই সময় কাটাবে।'

সেও জানাল, 'আমি কথা দিচ্ছি, আপনার এই পরামর্শ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।'

প্রায় এক বছর পর সে আমায় আবার ফোন দিলো। আমি তার পড়াশোনার খবর জানতে চাইলে সে ফার্স্ট ইয়ারে তার জিপিএ এসেছে ৪.৯০। সাথে পছন্দমতো বিভাগ বেছে নিতে পেরেছে এবং যে সাবজেক্টে ইচ্ছা পড়তে পারছে। আমার প্রতি সে কৃতজ্ঞতা জানাল।

আসল বিষয় হলো, আমরা আমাদের বন্ধুদের দ্বারা কতটা গভীরভাবে প্রভাবিত হই তা আমরা নিজেরাও জানি না। এটাই তিক্ত সত্য। আপনি কাদের সংস্পর্শে থাকেন, এটা শুধু আমাকে বলুন। আপনি কেমন মানুষ, তা আমি বলে দিতে পারব।

কার সংস্পর্শে থাকেন বলতে এটা বোঝাচ্ছি না বিশ্রামের সময়টা কাদের সাথে কাটান। বরং এর পরিসর আরো ব্যাপক। আমি এখানে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমের বন্ধুদেরও অন্তর্ভুক্ত করছি। টুইটার-স্ন্যাপে আপনি কাদের ফলো করেন।

এগুলো জানলে আমি বলে দিতে পারব আপনি কেমন মানুষ। আপনি যদি সফল মানুষদের অনুসরণ করেন, তাহলে একদিন আপনিও সফল হতে পারবেন। আর যদি কেবল সেলিব্রেটিদের অনুসরণ করেন যারা আপনার জ্ঞান এতটুকুও বৃদ্ধি করতে পারবে না, তাহলে আপনার জীবনও অপ্রয়োজনীয় আর অনর্থক কাজে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

চিন্তার খোরাক

একজন মনোযোগী বন্ধু বেছে নিন। একজন একাগ্র লেখককে অনুসরণ করুন। এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করুন, যেখানে লেগে থাকতে পারবেন। দিনগুলো যেতে না যেতেই দেখতে পাবেন কী চমৎকার ফলাফল পাচ্ছেন আপনি!

MDH

তৃতীয় অধ্যায়

মনোযোগের কিছু উদাহরণ

ইতিহাসের সোনালি পাতা

ইতিহাসের সোনালি পাতাগুলো আমাদের শিখিয়ে দেয় কীভাবে মনোযোগের মাধ্যমে জীবন গড়া যায়। মনোযোগ ঠিক রেখে এক পর্যায়ে সফলতায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। একাগ্রতার মাধ্যমে স্বপ্নপূরণ করতে তারাই সক্ষম হয়েছে যারা দিনে দিনে আগ্রহ ধরে রাখতে পেরেছে।

আবু বকর সিজিস্তানির জীবন থেকে নেওয়া—তিনি বলেন, আমি এক দিরহাম হাতে নিয়ে কুফা নগরীতে প্রবেশ করলাম। সেটা দিয়ে ৩০ মুদ্দ[১] পরিমাণ শিমের বিচি কিনলাম। এরপর থেকে আমি আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ থেকে হাদিস লিখতাম আর শিমের বিচি খেতাম। ঐ ৩০ মুদ্দ শিমের বিচি যখন শেষ হলো, তখন আমার ৩০ হাজার হাদিস লেখা হয়ে গিয়েছে।[২]

ইবনু আবি হাতিম আর-রাযি তার *আল-জারহ ওয়াত-তা'দিল* গ্রন্থের শুরুতে বলেন, বাবাকে বলতে শুনেছি, প্রথম যখন আমি হাদিস অন্বেষণে বের হই, তখন

---

[১] একটি নির্দিষ্ট আকারের পাত্রের পরিমাণকে মুদ্দ বলা হয়। কাপ বা মগ-জাতীয়। আর আনুমানিক পরিমাণ হলো দুই হাত মোনাজাতের মতো একত্র করে তাতে যতটুকু ফসল নেওয়া যায়।

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ১৩; পৃষ্ঠা : ২২৩

৭ বছর ভ্রমণ করেছি। পায়ে হেঁটে হাজার 'ফারসাখ[১]' অতিক্রম করেছি যতদূর হিসেব করে বুঝি।[২]

এ কথা লেখার পর ইমাম যাহাবি বলেন, 'দৃঢ়তার সাথে পথ চললে প্রায় চার মাসের পথ।' ইবনু আবু হাতিম বলেন, 'তারপর আমি হিসেব করা ছেড়ে দিই। বাহরাইন থেকে হেঁটেই মিশরে যাই। সেখান থেকে রামলা, দামেস্ক, এন্টিক, তারতুস, হিমস, রাক্কা এবং ইরাকে যাই। এসব শহরে আমি প্রথম যখন যাই তখন আমার বয়স ২০ বছর।[৩]

আবুল আব্বাস আস-সালাব বলেন, আমি গত ৫০ বছরে ইবরাহিম হারবিকে ভাষা বা নাহুর কোনো মজলিসে অনুপস্থিত দেখিনি।[৪]

আবু মাসউদ আব্দুর রহিম আল-হাজি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু তাহিরকে বলতে শুনেছি, হাদিসের অন্বেষণে আমি পথে দুবার রক্তপেশাব করেছি। এক বার বাগদাদে, আরেক বার মক্কায়। আমি গরমের মাঝে খালি পায়ে হাঁটতাম, তাই আমার এমন পরিণতি হয়েছিল। হাদিস অন্বেষণে কখনো আমি কোনো বাহনে চড়িনি। আমার সব বই বহন করতাম পিঠে।[৫]

জাহিযের জীবনী লিখতে গিয়ে যাহাবি বলেন, তিনি ছিলেন জ্ঞান-সমুদ্র। তার রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে। তিনি হাতে যে বই পেতেন তা-ই পড়ে শেষ করে ফেলতেন। এমনকি তিনি বইয়ের দোকানে রাতে থাকার জন্য দোকানিকে ভাড়া দিতেন। মুখস্থশক্তিতে একজন অতুলনীয় মানুষ ছিলেন তিনি।[৬]

মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-বুখারি বলেন, আমি একরাতে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল আল-বুখারির বাড়িতে ছিলাম। রাতের বেলা একটু পরপর তার কিছু একটা মনে

---

[১] ফারসাখ বলতে তিন মাইল বোঝানো হয়।

[২] *আল-জারহ আত-তাদিল*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩৫৯

[৩]প্রাগুক্ত

[৪] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ৩৩

[৫] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ১৯; পৃষ্ঠা : ৩৬৩

[৬] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৯; পৃষ্ঠা : ৪১৩

পড়ে যাচ্ছিল। আর তখন তিনি বিছানা থেকে বারবার উঠে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে সেগুলো লিখে রাখছিলেন। আমি গুণে দেখি, সেই রাতে তিনি মোট ১৮ বার এমনটা করেন।[১]

খতিব বাগদাদি বলেন, ভাষাবিদ আলি ইবনু উবাইদিল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু জারির বিগত ৪০ বছর ধরে প্রতিদিন ৪০টি কাগজ[২] লিখে আসছেন।[৩]

মহান ব্যক্তিদের ঘটনা এমনই, আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের চেষ্টা সফল হয়েছে। এই একাগ্রতার গল্প মাথায় রেখে কোনো মানুষ যদি তার চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা থেকে দীর্ঘ বছর পিছপা না হয়, তবে সে একজন প্রত্যয়ী হিসেবে বিবেচ্য। সে নিজের স্বপ্ন পূরণে সক্ষম এবং এরই সূত্র ধরে লক্ষ্যে পৌঁছায়, গড়ে তোলে তার মর্যাদার প্রাসাদ।

যদি ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাতে বদ্ধপরিকর হন, তাহলে আপনার কাজ হলো নিজের চিন্তায় মনকে পুষ্ট করা, প্রকল্পের সফলতার কথা ভাবা এবং যে কাজে অগ্রসর হচ্ছেন তা আঁকড়ে ধরা। এই পরিকল্পনা দিয়ে আপনার জীবনকে গড়ে তুলুন, জীবনের গল্প লিখুন।

চিন্তার খোরাক

কিছু তালিবুল ইলম আছে যারা ৫ বছরে এমন কিছু করে দেখাতে পারে, যা অন্যরা ৫০ বছরেও অর্জন করতে পারে না। আর তা করা সম্ভব হয় কেবল মনোযোগ, ব্যবস্থাপনা আর ধারাবাহিক পদক্ষেপের মাধ্যমেই।[৪]

ভীনদেশি মানুষের সফল জীবন

অনেক সময় মহান অর্জন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে এর পেছনে লুকিয়ে থাকা শত কষ্ট নিয়ে ভাবার সময় হয় না। এই যে মহান অর্জন, এটার মাত্রা যেমনই হোক,

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩২২

[২] তখনকার সময় কাগজ বলতে পৃষ্ঠা বা চ্যাপ্টার বোঝানো হতো।

[৩] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৫৪৮

[৪] আব্দুল কারিম আল-খুদাই রাহিমাহুল্লাহর বাণী।

দিনশেষে এটা কোনো একটা অভ্যাসেরই ফল। কালক্রমে বাস্তবতায় রূপ নিতে পেরেছে সেটা।

আপনি যদি জাপানি তাকিও ওশাহেরার জীবনী পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন কীভাবে মনোযোগ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে।

জাপান এক সময় অটোমেটেড মেশিন বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র শিল্পে উন্নতি করার সিদ্ধান্ত নেয়, তা শেখার জন্য জাপান সরকার একজনকে নির্বাচিত করে। জাপানের শাসক তাকে জার্মানিতে পাঠায়, যাতে সে ঐ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে নিজ দেশে ফিরে আসতে পারে। সে জার্মানিতে গিয়ে টানা ১৮ বছর কাজ শেখে। অবশেষে সে যখন ফিরে আসে তখন সমস্ত চিন্তা তার মাথায় গেঁথে গেছে। সে নিজ দেশে ফিরে তা বাস্তবায়ন করে দেখায়। যখন জাপানের রাষ্ট্রপতি এসে দেখতে পেলেন অটোমেটেড মেশিন চলছে, তখন তাকিও ওশাহেরা বাড়ি ফিরে গেলেন। তিনি বলেন, 'বাসায় গিয়ে আমি ১০ ঘণ্টা ঘুমালাম। গত ১৮ বছরে এটাই ছিল আমার প্রথম একটানা ১০ ঘণ্টা ঘুম।'

এই ঘটনাটা মাথায় গেঁথে নিন। সময় বের করে চিন্তা করে দেখুন। দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে না রাখলে চিন্তা পরিপক্ব হয় না। সময় ব্যয় না করলে সফল হওয়া যায় না।

কেবল অবসর সময়কে ব্যয় করলে চিন্তা পরিপক্ব হবে, পরিকল্পনা সফল হবে, যুগান্তকারী লক্ষ্য পূরণ হবে—এমনটা আশা কখনো করবেন না। কক্ষনো না! আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে, দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম, ঠান্ডা-গরম, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, প্রবাস-নিবাস, ভালো-খারাপ সব সময়ে আপনি মনোযোগ ধরে রাখতে পারবেন। যদি এভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারেন, তবেই আপনার হৃদয় থেকে অনুভূতি আহরণ করে আপনার চিন্তারাও জীবন্ত হয়ে উঠবে।

জাপানি সেই অগ্রদূত তার জীবনের ১৮টি বছর একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পেছনেই ব্যয় করেছেন। তার অবর্ণনীয় পরিশ্রমের ফলেই জাপান শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথে বহুদূর এগিয়ে গেছে। ইউরোপ যখন শিল্পায়নের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে, তখন জাপানও তাদের থেকে শিখে নিয়ে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজও তার সুফল ভোগ করে চলেছে জাপান।

১৯৯৮ সালে একই কাজ করেছিল নিঃস্ব হতে যাওয়া অ্যাপল কোম্পানি। দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল তারা, কোম্পানি বন্ধ করে দিতে হবে তিন মাসের মাঝে। তখন পরিচালনা পরিষদের সবাই মিটিংয়ে বসল। তারা সিদ্ধান্ত নিলো, ১৯৯২ সালে কোম্পানি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া স্টিভ জবসকে আবার ফিরিয়ে আনবে। স্টিভ জবস এসে পরিচালনা কমিটির সবাইকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখলেন। সেখানে লেখা ছিল, 'পরিচালনা কমিটির সবাইকে পদত্যাগ করতে হবে। নতুবা পরদিন আমার পদত্যাগ পত্র পেয়ে যাবেন।' তারপর বেরিয়ে গেলেন তিনি। বাধ্য হয়ে পরিচালনা কমিটির সবাই পদত্যাগ করে। লোকটাকে তারা সংকটপূর্ণ অবস্থায় রেখে যায়; যেখান থেকে বের হওয়ার উপায় তার ছিল না।

স্টিভ জবস ফিরে এলেন তার কোম্পানিতে। সেখানে তখন প্রায় কোম্পানিতে দুইশটি পণ্য উৎপন্ন করা হতো। স্টিভ জবস মাত্র চারটা রেখে বাকিগুলো বন্ধ করে দিলেন যাতে পরিমাণের চেয়ে উন্নত মানের বিষয়টা নিশ্চিত করা যায়। অর্থাৎ, Quality over quantity.

কোম্পানিতে দায়িত্ব পাওয়ার এক বছরের মাথায় তিনি ঐ কোম্পানির সব উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিকে জড়ো করেন। তাদেরকে আগামী এক বছরের জন্য নতুন কোনো পণ্য উৎপাদন করার কথা ভাবতে বলেন। দশজনের চিন্তা জমা হয়। তিনি কাগজে সেগুলো লিখে ফেলেন। তারপর সাতটা নাম কেটে দিয়ে বলেন, 'অ্যাপল কোম্পানি মাত্র তিনটার দিকে মনোযোগ দেবে।'

এক লেখক স্টিভ জবসের জীবনী লিখলেন। এতে তিনি স্টিভের সফলতার পেছনে পাঁচটি কারণ নির্ণয় করলেন। সেই তালিকার শীর্ষে ছিল মনোযোগ। একাগ্রতা ধরে রাখার মাধ্যমে দেউলিয়া হতে বসা একটা কোম্পানিকে তিনি এমন একটা কোম্পানিতে পরিণত করেন যে, সেটার বাজেট বেশ কয়েকটা দেশের বাজেটকে ছাড়িয়ে গিয়েছে! দুইশো পণ্যকে কমিয়ে মাত্র তিনটি পণ্যে সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, মনোযোগ আমাদের জীবন গড়তে পারে।

চিন্তার খোরাক

আপনি যদি সব কিছুই পেতে চান, আর সব কাজের সময় দিতে থাকেন; তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনি কোনো কাজই শেষ করতে পারবেন না। কীভাবে চিন্তা, পরিকল্পনা বাছাই করবেন; কোনো কিছু কীভাবে সম্পাদন করবেন তা নির্ধারণ করুন। তারপর

সেটার পেছনে আপনার শক্তি-দক্ষতা-সক্ষমতা-সময়কে ব্যয় করুন। কোনো একদিন আপনার রচিত সফলতা, অর্জন আর অগ্রগতির গল্প শোনার অপেক্ষায় থাকলাম...

কেমন হতে পারে আপনার অনুশীলন

একবার মক্কায় জামিউর রাজিহিতে বেড়াতে গেলাম। এক তলা থেকে আরেক তলায় যাওয়ার পথে সেখানকার কার্যক্রম সম্পর্কে শুনতে লাগলাম। হঠাৎ কুরআন হিফয করার একটা হালাকার কথা কানে এলো, সেখানে মাত্র ৬০ জন ছাত্র। অথচ জামিউর রাজিহির ছাত্রসংখ্যা ছয়শোরও বেশি। এখানে কমসংখ্যক ছাত্র ভর্তি করানো হয় যেন তারা মনোযোগ ধরে রাখতে পারে। অধিকাংশ ছাত্রের একঘেঁয়েমি চলে এলে তারা আর চালিয়ে যেতে পারে না।

মনোযোগের অভ্যাস গড়ে তোলার একটা উপায় এমন যে, একজন ছাত্র প্রতিটি আয়াত চল্লিশবার নির্ভুলভাবে পড়ে। তারপর উস্তাযকে সেটা শোনায়। এভাবে করতে করতে এক সময় ছাত্র পুরো কুরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয়। হিফয শেষ করার পর যখন সে কুরআন উপস্থাপন করে তখন একটি হরফও ভুল হয় না তার।

সে সময়টাতে শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন না। আমি তার মোবাইলটা হাতে নিয়ে এ পদ্ধতির ফলাফল কেমন জানতে চাইলাম। সে জানাল, এই পদ্ধতি অনুসরণ করে একজন বয়স্ক মানুষও হিফয শেষ করেছে এ সপ্তাহে। একাধিক মজলিসে কুরআন শোনাতে তার কোনো ভুল হয়নি।

আমি নিজেও এটা যাচাই করে ফল পেয়েছি। যে সুরাগুলো আমি এভাবে বারবার পড়েছি, সেগুলো জাহরি সালাতে[১] মুসল্লিদের নিয়ে পড়তে গিয়ে আমি কোনো ভুল করিনি। কিন্তু যেগুলো এ পদ্ধতিতে মুখস্থ করিনি, সেসবে আমার অগণিত ভুল হয়।

ইউটিউবে চোখে পড়ে খেলোয়াড়রা পায়ে লম্বা সময় ফুটবল ধরে রাখছে; এক মূহূর্তের জন্যও সেটা পড়ে যাচ্ছে না পা থেকে। বল নিয়ে খেলতে খেলতে রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে, থামার প্রয়োজন হচ্ছে না। তার যেমন থামানোর প্রয়োজন পড়ে

---

[১] যেসব সালাতে কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হয়।

না, তেমন পা থেকেও পড়ে যায় না। এমনকি পা দিয়ে লাথি দিয়ে সে একবারেই গোল দিয়ে দিচ্ছে। কখনো পা থেকে সেটা জালে গিয়ে বিদ্ধ হচ্ছে। কখনো আবার দেওয়াল বরাবর বলে লাথি মারছে এবং সেটা দেওয়ালে লেগে সরাসরি জালে ঢুকে যাচ্ছে। আবার দুইটা বল নিয়ে একটা আকাশে ছুড়ে মারছে। তারপর অন্যটা লাথি মেরে প্রথম বলে লাগাচ্ছে। এ জন্য বারবার চেষ্টাও করতে হচ্ছে না। এমন ভিডিও দেখেছি, বহু দূর থেকে লাথি মেরেও ফুটবলকে জালে জড়াতে পারছে। যদি জিজ্ঞেস করেন, 'কীভাবে সে এত দক্ষ হলো?' তাহলে উত্তর আসবে, 'একাগ্রতা।' সে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে, অনুশীলন করেছে; যতদিন আয়ত্ত করতে না পেরেছে সংগ্রাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এরপর একদিন সে এটা অর্জন করেও নিতে পেরেছে।

এমন মানুষকে হয়তো আপনি দেখেছেন, অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে দুই হাত দিয়ে কিবোর্ডের সাহায্যে টাইপ করে যাচ্ছে। সে এত দ্রুত টাইপ করছে যে, আপনার মনে হচ্ছে, আপনি সব কিছু ব্যয় করেও যদি তার মতো করতে পারতেন! এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, পৃথিবীতে সব কিছুই সম্ভব। আপনি কোনো কিছু করতে চাইলে যত কষ্টই হোক, অর্জন করতে পারবেন।

এ মুহূর্তে আমার এ বইটি যিনি পড়ছেন, তাকে বলছি, আপনার যদি কোনো কিছুতে তীব্র আগ্রহ থাকে, তাহলে সে কাজে সময় দিন। সেটা শেখার পেছনে সময় বাড়িয়ে দিন। সেই কাজে মনপ্রাণ সব ঢেলে দিন। দিনে-রাতে কখনো ছাড়বেন না সেটা। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ আপনি একদিন অনুসরণীয় একজন ব্যক্তিতে পরিণত হবেন। আপনার পরে আরো বহু প্রজন্ম এসে আপনার অভিনব আবিষ্কার দেখে যাবে। তারাও চাইবে আপনার মতো কিছু করে যেতে।

চিন্তার খোরাক

আপনি কি কখনো এমন কোনো নিরক্ষর নারীর কথা চিন্তা করতে পারেন, যিনি আরবির 'আলিফ'-ও জানেন না; অথচ ৭০ বছর বয়সে প্রায় সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করে ফেলেছেন? জি, এমনটাই ঘটেছে বাস্তবে! দিনের বড় একটা অংশ তিনি ক্বারীদের তিলাওয়াত শুনে ব্যয় করতেন। এভাবে শুনতে শুনতে একদিন তিনি তার লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছেন।

আরও কিছু বিস্ময়কর উদাহরণ

যে মানুষগুলো ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে, জীবন গড়তে সক্ষম হয়েছে কিংবা ইতিহাস গড়তে পেরেছে; তাদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, একাগ্রতাই ছিল তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। তারা যা কিছু করতে পেরেছে, যে বিষয়গুলো রেখে যেতে পেরেছে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য; সেগুলোর পেছনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে এই মনোযোগ।

উদাহরণ হিসেবে ইমাম ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দীর্ঘ দিন তিনি ফিকহের ইমাম ছিলেন। উম্মাহর জন্য ফিকহের সমৃদ্ধ এক ভাণ্ডার রেখে গেছেন, যা থেকে আজও সকলে গ্রহণ করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

হাদিসের ক্ষেত্রে শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহর অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মুসলিমদের দরসে, বিভিন্ন আলোচনায় তার নাম বহুবার উচ্চারিত হয়, এটা সবাই স্বীকার করবে। 'শাইখ আলবানি সহিহ বলেছেন', 'শাইখ আলবানি হাসান বলেছেন', 'শাইখ আলবানি দুর্বল বলেছেন'—অহরহ এসব শুনতে পাওয়া যায়। আর তার এ সব অর্জনই মনোযোগের ফসল। তিনি একটি কাজেই নিজের পুরোটা সময়টা ব্যয় করেছেন। তাই ফিকহের ওপর তার আলাদা কোনো বই আপনি দেখবেন না। যদিও তার মতামত নিয়ে আলাদা জ্ঞানগর্ভ গবেষণাপত্র বের হয়েছে। কিন্তু তিনি যে কারণে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, যে শাস্ত্রের কারণে বিখ্যাত হয়েছেন, যার পেছনে জীবনটা দিয়ে দিয়েছেন, তা হচ্ছে হাদিস। তাই দেখতে পাবেন, মুসলিমরা আজও তার ব্যাপারে আলোচনা করছে, তার সম্পর্কে জানাশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

আপনি যদি কোনো সফল ব্যবসায়ী দেখেন, তাহলে ধরে নেবেন, তিনি তার সারাটা জীবন টাকার পেছনে ছুটে সেটার লাগাম ধরে নিজের আঙিনায় আনতে পেরেছেন। সুলাইমান আর-রাজিহি হাফিযাহুল্লাহর জীবনীটা দেখুন। ইন্টারনেটেই বিস্তারিত পাওয়া যাবে। ছেলেবেলা থেকে ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত একটানা এক বিষয়ে মনোযোগ ধরে রেখেছিলেন তিনি। কখনো নিজের পরিকল্পনা থেকে একচুল পিছপা হননি। কখনো স্বপ্নের চিন্তা ছেড়ে দেননি। আমি যখন এই বাক্যটি লিখছি, তখনও তার মনোযোগ অক্ষুণ্ণ। এই স্থিতির মাধ্যমে তিনি নিজের এবং জাতির আশাকে সামনের দিকে ঠেলে দিতে পেরেছেন।

যিনি ডাক্তারির কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হন, তিনি বহু বছর সেটা চালিয়ে যান। এক মুহূর্তও দমে যান না। এর মাধ্যমে তিনি বহু মানুষের উপকার করতে সক্ষম হন।

যে প্রকৌশলী তার পেশাগত কাজকর্মে আনন্দ খুঁজে পায়, সে কতশত রাত যে কেবল আঁকিবুকি আর নকশার মাঝে কাটিয়েছে তা সে নিজেও জানে না। অথচ এ সময়গুলোতে তার বন্ধুরা আনন্দ-ফুর্তি আর খেল-তামাশায় কাটিয়ে দিয়েছে।

ফার্‌রা বলেন, কিসায়ি[১] নাহু শিখেছেন বড় হওয়ার পর। কিসায়ি কে সেটা নিশ্চয় আপনি জানেন!

আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ আল-মারওয়াযি। তার অপর নাম 'আল-কাফ্‌ফাল'। তার জীবনী লিখতে গিয়ে ইমাম যাহাবি বলেন, 'তিনি তালা বানানোর কাজে বেশ দক্ষ ছিলেন। জীবনের ৩০টি বসন্ত কেটে যাবার পর তিনি নিজের মাঝে বুদ্ধিমত্তার ছাপ দেখতে পান। ফিকহকে ভালোবেসে ফিকহে পারদর্শিতার কাজে অগ্রসর হন। এক পর্যায়ে তাতে এত বেশি পারদর্শিতা অর্জন করেন যে, বর্তমানে তাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

ফকিহ নাসির আল-উমরি বলেন, আবু বকর আল-কাফ্‌ফালের যুগে তার থেকে বড় ফকিহ আর কেউ ছিল না। তার পরেও তার মতো ফকিহ আসেনি। আমরা বলতাম, তিনি মানুষরূপী ফেরেশতা। তিনি কথা বললে লেখক তা লিখে রাখত। ফিকহের একজন স্তম্ভ এবং যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতায় একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি।

ভেবে দেখুন, আবু বকর আল-কাফ্‌ফাল ফিকহ শিখেছেন ত্রিশে গিয়ে। এর আগে তিনি পেশায় একজন তালাচাবির কারিগর ছিলেন। আর তাতেই অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। নতুন করে একটা জ্ঞানশাস্ত্রে যখন প্রবেশ করেছেন, তখন শুরুতে কিছুই জানতেন না। কিন্তু পরিশেষে তিনি হয়ে গেলেন সেই ইলমের একজন সর্দার, এক আদর্শ। মানুষের জীবন এমনই!

---

[১] তিনি একজন বিখ্যাত আরবি ভাষা ও ব্যাকরণবিদ। সেই সাথে সাত কিরাআতের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৮৯ হিজরিতে।

আমি আগেও আপনাকে বলেছি, ফুটবলে যে সময় দিয়েছে, নিজের চিন্তা ও অনুভূতিকে ফুটবলের পেছনে ব্যয় করেছে; তার পায়ে ফুটবল এসে ধরা দিয়েছে। আর জীবনের ব্যাপারে আপনিই তো ভালো বুঝবেন!

যারা সফল হতে চায়, তারা তো এর খোঁজই করে। যেন তাদেরকে বলা হচ্ছে, 'যারা মনোযোগের সাথে সমঝোতা করতে পেরেছে, ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, কোনো কিছু নির্ধারণ না করেই নতুন করে যাত্রা শুরু করেছে; তারাই নিজ লক্ষ্যে পৌঁছেছে, স্বপ্ন পূরণের সৌভাগ্য তাদেরই হয়েছে।'

হে পড়ুয়া প্রজন্ম, হে তরুণ সম্প্রদায়, জীবন তো মনোযোগেরই অংশ। মনোযোগ সকল সাফল্যের চাবিকাঠি। আপনারা যদি গন্তব্যে পৌঁছতে চান, তাহলে এই একটা জিনিস বেছে নিয়ে পৃথিবীর বুকে পথ চলতে শুরু করুন। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমরা যে পথ বেছে নিয়েছি, একদিন সে পথের শেষ নাগাদ পৌঁছবই। ঐ গন্তব্যে পৌঁছনোর আগে আমরা যেন কখনো হাল ছেড়ে না দিই! পুরোটা সময় জুড়ে আমরা আশার আলোর প্রদীপে সলতে দিয়ে যাব এটাই কাম্য।

চিন্তার খোরাক

যে চিন্তা ও দক্ষতার পেছনে আপনি প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা করে সময় ব্যয় করছেন, নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি একদিন সেটা ঠিকই অর্জন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। সে কাজে একদিন আপনি ঠিকই যোগ্য হয়ে উঠবেন। যে প্রকল্পে আপনি দিনের পর দিন সময় ব্যয় করে যাবেন, কয়েক বছর বাদে সে প্রকল্পেই আপনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন। তাই কখনো নিজের জীবনে পাওয়া সুযোগগুলো হাতছাড়া করবেন না!

জ্ঞানীরা যেভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন

বর্তমান সময়ে উম্মাহ অজস্র মৌলিক সমস্যার মুখোমুখি। তার মধ্যে একটি হলো, বাস্তব জীবনের সাথে তাত্ত্বিক ইলমের সংযোগ ঘটাতে পারে এমন তালিবুল ইলমের অভাব। উম্মাহ শুধু পূর্ববর্তীদের করে যাওয়া কাজই দেখে চলেছে বছরের পর বছর ধরে। আশা যত বাড়ে, অপেক্ষারাও বাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। এই অন্তহীন শূন্যতা, অতলান্ত নিরাশার নিগূঢ় রহস্য কেবল আল্লাহই ভালো জানেন। তবে আমরা খানিকটা অনুমান করতে পারি সম্ভবত। তালিবুল ইলমের আশা পূরণের পথে যে

অসংখ্য বাধা-বিপত্তি রয়েছে, সেগুলো তাকে অর্জিত ইলমের বাস্তব প্রয়োগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। সে যা অর্জন করতে চায়, সেদিকে মনোযোগী হতে পারছে না। তার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা কমে এসেছে। স্বপ্নের মখমলি বসন ছিঁড়তে বসেছে। তাই সে না পারছে নিজের দৈন্য বুঝে নিয়ে মনোযোগের মাধ্যমে তা সামলে নিতে, আর না পারছে উম্মাহর জন্যও দীর্ঘমেয়াদি কিছু করতে।

লক্ষ্যপূরণের পথে হাজারো বাধা-বিপত্তি আসে আমাদের জীবনে। কিন্তু সাধারণ মানুষের এসব ঝুটঝামেলার সাথে তালিবুল ইলমদের ঝুটঝামেলা মিলিয়ে ফেললে চলবে না। কারণ যে ব্যক্তি সদা সচেতন, যার ওপর সবার অগাধ আস্থা ও সীমাহীন আশা রয়েছে, সে এসব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু একজন তালিবুল ইলমের সবচেয়ে বড় মসিবত হলো, ইলম অর্জনের পথে সে মনোযোগ পায় না। তাই সারাজীবন বইয়ে মুখ গুঁজে কাটিয়ে দিলেও তার অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ খুব সামান্য। একজন সত্যিকারের আদর্শ ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া তার জন্য দিবাস্বপ্নই থেকে যায়। ভেবে দেখুন, কী ভয়াবহ ব্যাপার!

এ বইটি হয়তো এমন সংকট থেকে উত্তরণের একটা সিড়ি হয়ে দাঁড়াবে, আগামী দিনগুলোতে কিছু করার জন্য এবং নিজেকে নতুন করে সংশোধনের জন্য একটা উপকরণে পরিণত হবে।

অনেক তালিবুল ইলমের সমস্যা হলো তারা তাদের জীবনের সবচেয়ে দামি সময়টা ইলমের শাখা-প্রশাখা মুখস্থ করার কাজে কাটিয়ে দেয়, অথচ মৌলিক বিষয়ে থাকে বেমালুম বেখবর। মাসআলা শেখায় তার ক্লান্তি নেই, অথচ সে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে না। তাই জীবনের দীর্ঘ সময় চলে যায় এই শাখা-প্রশাখায় ঘোরাঘুরি করেই। অথচ তারা যদি মূলকে আঁকড়ে ধরত, তাহলে তাদের কাছে শাখা-প্রশাখা সশ্রদ্ধ মস্তকে ধরা দিত, কিছুই বাদ থাকত না।

সুলাইমান ইবনু নাসির আল-আবুদি তার *মিরকাত* গ্রন্থে এ ব্যাপারে খুব দামি একটা কথা বলেছেন—'জ্ঞানের যে ভূমি, যে মূলনীতিসমূহ, সেটা অর্জনের পেছনে একজন তালিবুল ইলম দিন-রাত ব্যয় করার পর এক সময় তার হৃদয়ে জ্ঞান স্থান করে নেয়। তখন চুম্বকের মতো অন্য সব জ্ঞানের খনিকে নিজের দিকে সে টানতে থাকে, কিছুই আর ভোলে না। জ্ঞানের কোনো এক বিষয়ের ভিত্তিপ্রস্তর সঠিকভাবে স্থাপিত হলে শাখা-প্রশাখা খুবই সহজ হয়ে যায়।'

ইবনু আব্দিল বার বলেন, 'সর্বোত্তম জ্ঞান হলো যার মূল আত্মস্থ করা হয়েছে আর শাখা-প্রশাখা স্মরণ রাখা হয়েছে।'

এরপর সুলাইমান তালিবুল ইলমের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, 'কীভাবে একজন তালিবুল ইলম মূলকে আত্মস্থ করবে?'

প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, এ প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে দিতে হবে। তিনি কেবল ইলম অর্জনের একটি উপায় দেখিয়ে দিলেন, যা অতীত-বর্তমানের সকল আলিম অনুসরণ করেন। যে এই পথ অনুসরণ করে, সে-ই সুমিষ্ট ফল লাভ করে। কিন্তু সেটা অর্জনের বিষয়টা নির্ভর করে তালিবুল ইলমের দৃঢ়তা আর এক বইয়ে বারবার নজর দেওয়ার মানসিকতার ওপর। ফসল কাটার মৌসুম পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারবে কে? সে পদ্ধতিটা হলো যেকোনো কিছুর সারসংক্ষেপ করে নেওয়া।

তারপর তিনি জানালেন, এটা ইমাম যাহাবির পদ্ধতি। কত বইয়ের যে তিনি সংক্ষেপণ করেছেন! এমনকি মক্কার ঐতিহাসিক তাকিউদ্দিন ফাসি তার ব্যাপারে বলেছেন, 'তিনি অন্য কারো যে বই পেয়েছেন, অমনি সেটা সংক্ষিপ্ত করে কিছু সংযুক্তি এনে দিয়েছেন এবং নিজের মতো বাছাই করেছেন।

ইমাম যাহাবি কখনো আমাদের মতো বিভিন্ন বইয়ে দুয়েকবার চোখ বুলিয়ে এরপর নতুন কোনো বই হাতে নিতেন না; বরং এক বই-ই বারবার পড়তেন।

যাহাবি রাহিমাহুল্লাহর মতো ছিলেন *আল-লিসান* প্রণেতা ইবনু মানযুর। তার ব্যাপারে সাফাদি বলেন, আমার জানামতে সাহিত্যের এমন কোনো বড় গ্রন্থ নেই যা থেকে তিনি নির্যাস বের করেননি।'

আমি তালিবুল ইলমদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, জ্ঞানের মূলনীতি ও নিয়মকানুনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রতিটি বিষয়ের বিশেষায়িত জ্ঞানের কিছু নিয়মনীতি আছে যেগুলো পড়া, মুখস্থ করা, আত্মস্থ আর পুনরাবৃত্তি করার কাজে সময় দেওয়া অতীব জরুরি।

তালিবুল ইলমের জন্য কিছু কিছু বইয়ের সঙ্গ ত্যাগ করা কখনোই উচিত নয়। বারবার সেগুলোর দিকে ফিরে আসা উচিত। সেগুলোর ওপরই বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জনে সময় দেওয়া জরুরি। হোক সেটা ফিকহ, হাদিস, তাফসির কিংবা আকিদার

বই। সময় যতই গড়িয়ে যাক, বারবার পড়ে যেতে হবে বইগুলো। এক-দুই কিংবা তিনটি বই যেন তার দিন-রাত, সকাল-বিকাল, প্রবাস-নিবাসের সঙ্গী হয়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্যও সেগুলো যেন তার চোখের সামনে থেকে সরে না যায়। সাথে আরো কিছু বই যুক্ত হতে পারে, কিন্তু দিন-রাত সেই বিশেষ কয়েকটি বই কখনো তার হাতছাড়া হবে না। সে যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে চায়, তার দুয়েকটা এখানে থাকবে। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, আল্লাহ আমার প্রতি বিশেষ একটি অনুগ্রহ করেছেন, সেটা হলো বই সংক্ষেপণ করা। খুবই উপকৃত হয়েছি আমি। এমনকি দাওয়াতি কাজে কিংবা পড়ানোর ক্ষেত্রেও। নিজের জ্ঞানের ভিত্তি তৈরিতেও সাহায্য পেয়েছি। দিন যত গড়িয়ে যায়, এই নিয়ামতের স্বাদ তত গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করি আমি। এই অভ্যাসের ব্যাপারে আমার মনে যা কিছু আছে, তার বিস্তারিত যদি আপনাকে বলি তাহলে হয়তো আমার আনন্দানুভূতি ব্যক্ত করে শেষ করতে পারব না। জ্ঞানার্জনের প্রথম দিকে আমি এমনটা করেছিলাম। আমি যদি দেরি করতাম তাহলে হয়তো কিছুই অর্জন করা হতো না।

তালিবুল ইলম যদি এমন হয় তাহলে জ্ঞান অর্জনের আনন্দ অনুভব করা সহজ হয়। আল্লাহ সহায় হলে শীঘ্রই সে জ্ঞানের স্বাদ নিতে পারবে। ভরসা তো সুমহান রবের ওপরই। দিনে-রাতে সবসময় তাঁর কাছেই প্রার্থনা করি আমরা।

চিন্তার খোরাক

জ্ঞানের মূল ভিত্তিগুলোর দিকে নজর দিন। আশা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে দৃষ্টি সরাবেন না। দুই-তিনটা বই যেন সবসময় আপনার সাথি হয়ে থাকে। বারবার পড়বেন, নোট করবেন, টীকা-টিপ্পনী দেবেন। বাকি জীবন সে বইগুলো পড়বেন এবং পড়াবেন।

সমাজকল্যাণে মনোযোগের গুরুত্ব

এই যুগে উম্মাহর অনেক বড় বড় প্রজেক্ট বিভিন্ন লাইব্রেরি, সংস্থা, ইনস্টিটিউটের মাঝে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ঠিক যেন পাতায় লুকোনো ফুল, প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোর অপেক্ষায় বসে আছে। সেগুলোতেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। যতদিন সেখানে মনোযোগ দেওয়া না হবে, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসবে না। দিনশেষে দেখা যাবে, উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য অর্জিত হয়নি এই খাতগুলোতে।

আলোচ্য খাতগুলো কেউ পর্যবেক্ষণ করলে বেশ কিছু চমৎকার কাজ দেখতে পাবে। কিন্তু সবকটাতেই মনোযোগের অভাব লক্ষণীয়, অযত্নের ছাপ সুস্পষ্ট। এমন কিছু নেই যে কাল-পরিক্রমায় আমাদের গর্বের কারণ হয়ে উঠবে। সত্যিকার প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে বিরাট কিছুর প্রয়োজন। বাস্তবে টিকতে হলে আতশ কাঁচে দেখা বস্তুর মতো মনোযোগকেও বহুগুণে বর্ধিত করা প্রয়োজন।

দাওয়াতি সংস্থাগুলোতে বিভিন্ন পরিসরে কাজ করার। প্রতিষ্ঠানগুলো এর পাশাপাশি সব অঙ্গনে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। তারা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। আর যে জায়গায় আলোকপাত করা প্রয়োজন সেটা হলো, দাওয়াতের কাজে বিকল্প একটি দল তৈরি করা, যে দল প্রয়োজনে এর ভার বহন করবে এবং দায়িত্ব পালন করবে। নারী-পুরুষ উভয়ের মাঝেই এমন দায়িত্বশীল রেখে যাওয়া দরকার। এ জন্য তালিবুল ইলম, দাঈ, বিভিন্ন পরিকল্পনার মাস্টারমাইন্ড, সব ক্ষেত্রে পতাকাবাহী লোকের দরকার। নাহলে শক্তি, ক্ষমতা আর সম্ভাবনা অযথা বিনষ্ট হবে। পরিশেষে বাধ্য হয়ে মূল দায়িত্ব পালনই ছেড়ে দিতে হবে। পথ থেকে সরে দাঁড়ানো ছাড়া গতি থাকবে না।

বর্তমান সময়ে এই ক্ষেত্রগুলোতে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রচুর শক্তি খরচ হচ্ছে। এই ক্ষেত্রগুলো ধরে রাখতে হলে বর্তমান প্রজন্মকে যথার্থ ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম থেকে বাছাই করে সামনের দিনগুলোতে পতাকা বহন করার মতো নির্দিষ্টসংখ্যক মানুষ নির্বাচন করাটা আবশ্যক। এদের জন্য সাজানো-গোছানো বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য প্রকল্প লাগবে। একদিন না একদিন সোনালি দিনের আলোকছটা প্রতিভাত হবেই।

একইভাবে, প্রকল্পের কোন কাজগুলো প্রাধান্য পাবে সেটাও নির্ধারণ করার ব্যাপারে মনোযোগ থাকা চাই। মূলনীতির ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠুন। যেমন : তাওহিদ, ইসলামের ভিত্তি, অন্তরের পরিশুদ্ধি, ঐক্য এবং মুসলিম সমাজ গঠনের দাওয়াত। এসব কাজের মাধ্যমে আমাদের পারস্পরিক বন্ধন আরো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

বিভিন্ন দাওয়াতি সংস্থা যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা খুবই চমৎকার! কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা জরুরি। এই সংস্থাগুলোর অগ্রাধিকার তালিকায় কি

এমন কোনো তিনটি কাজ আছে যার জন্য এরা সর্বোচ্চ সময়, অর্থ ও পরিশ্রম দিতে প্রস্তুত? ৫ বছর পর কি তারা আদৌ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে?

এ প্রশ্নের উত্তরই আমাদেরকে আশ্বস্ত করবে, আমরা কি এই সংস্থাগুলোকে গুরুত্ব দেবো নাকি বিক্ষিপ্ততার অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার জন্যই এদের জন্ম।

হিফয শাখাগুলো আগামী প্রজন্মের নতুন সব কুঁড়িকে ধারণ করে আছে। এগুলোতে এমনভাবে বিনিয়োগ করা দরকার যাতে সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। যথাসময়ে যাতে এর থেকে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

একজন তালিবুল ইলম কুরআন মুখস্থ করার কাজে যে সময় ব্যয় করে তা থেকে পিছু হটা কখনোই উচিত না। কারণ ব্যক্তি নিজেকে গঠন করার প্রথম ধাপ হলো ওহি হিফয করা। মুসলিম শিশুরা যদি কুরআন মুখস্থ করতে পারে তাহলে সব দাবির মুখে বুক উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। ইসলামের গণ্ডির ভেতর দৃঢ় অবস্থান নিতে পারবে। হিফয এতটা গুরুত্বপূর্ণ ও মহান হওয়ার কারণে ওহির আলোয় সবাইকে আলোকিত করার প্রকল্প হাতে নিতে হবে। যেমন : কুরআনের তাদাব্বুর প্রকল্প। কুরআনের বরকত থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এতটা পরিপুষ্ট হতে হবে যেন তারা ইসলামি ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। এদের সাথে দাওয়াতি সংস্থাগুলোর সম্পর্ক থাকবে। তারা দক্ষ এবং মেধাবীদের বাছাই করে জ্ঞানের বিভিন্ন কোর্সে নিয়োজিত করবে যাতে তারা নিজেদের যথাযথভাবে বিকশিত করতে পারে। ভবিষ্যতে এরাই নিজেদের জাতি, দেশ ও উম্মাহর পথপ্রদর্শক হয়ে উঠবে, সংস্কার আন্দোলনে সেনাপতির ভূমিকা পালন করবে।

দেশের কল্যাণসংস্থার পরিচালকদের উচিত নিজেদের প্রশ্ন করা—'কোন বড় প্রকল্পটিতে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন?' এরপর তাদের উচিত হাতে থাকা বিভিন্ন সেক্টরের লোকদের কাজে লাগিয়ে সংস্কারের কাজে মনোযোগী হওয়া।

শুধু মানুষকে খাবার আর কাপড় দেওয়ার মাঝে সীমিত থাকা কোনো কল্যাণসংস্থার জন্য খুব বেশি কল্যাণকর কিছু না। যদিও খাওয়া-পরা গুরত্বপূর্ণ, কিন্তু তার সাথে সাথে মূল্যবোধও পৌঁছে দিতে হবে যেন তা অর্থবহ হয়ে ওঠে। একজন দরিদ্র মানুষ যাতে অলসতা আর উদাসীনতায় জীবন কাটিয়ে না দেয়। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত জীবনযাপনে সে যেন অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে।

এই সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা ও প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য কিছু বিষয় খেয়াল রাখা অত্যাবশ্যক—

» কার্যকর প্রকল্পের উপস্থিতি

» যথাযথ বাস্তবায়ন

» সুস্থ ধারার সামাজিক প্রথা ও নিয়ম মেনে অগ্রসর হওয়া

» সামগ্রিক আয়কে উপযুক্ত খাতে বিনিয়োগ করা

একই কথা আপনি বলতে পারেন প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রেও। মনোযোগের অভ্যাস একজন মানুষের কাজে কতটুকু মূল্য রাখে তা আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে মূল্যবোধ গঠনে সেটা কীভাবে কাজে লাগাবেন তাও আপনি বুঝতে পারবেন। আর এর ফলে বাস্তবে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতেও সক্ষম হয়ে উঠবেন আপনি।

চিন্তার খোরাক

সভ্যতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে হলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টাগুলোর মাঝে সমন্বয় থাকা খুব জরুরি। ভবিষ্যতে নবজাগরণের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলতে এর কোনো বিকল্প নেই। ব্যক্তির আলো আলোকিত করবে পুরো সমাজকে। এভাবে আলোকিত সমাজ একটি শক্তিশালী জাতি গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মনোযোগ : ভারসাম্যের প্রয়োজনে ও রবের সান্নিধ্যে

শেষ পাতার আগের কথা

ধরা যাক, আপনার জীবনে কোনো স্বপ্ন ছিল না। আপনি আপনার গল্প নতুন করে লেখার কথা ভাবেননি। আপনার জন্য নতুন কোনো রাস্তাও খুলে যায়নি। কোনো ভালো চিন্তা আপনার মাঝে প্রভাব ফেলেনি। তাহলে কি আপনার জন্য প্রোডাক্টিভিটি লেসনস আর মনোযোগ-সম্পর্কিত বই পড়ার প্রয়োজন নেই? আপনি কি এ বই পড়বেন না?

আমরা বলব, না। বরং আপনি চাকরি জীবনে যেকোনো কাজ করার জন্য হলেও প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে থাকুন, মনোযোগের অভ্যাস গড়ে তুলুন। কালের পরিক্রমায় এ অভ্যাস আপনার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াবে। জীবনের যেকোনো পর্যায়ে আপনি কিছু একটা করতে পারবেন; কোনো না কোনো গঠনমূলক অবদান রাখতে একদিন সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ।

মনোযোগের এ অভ্যাসটি সন্তান প্রতিপালনেও আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন। ছেলেমেয়ে মানুষ করতে গিয়ে যে অবর্ণনীয় কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তার জন্যও তো মনোযোগ দরকার।

আমরা যে পরিবারে সন্তানদের সাথে ২০ বছর বা তারচেয়েও বেশি সময় কাটাই, এ দীর্ঘ সময়টা অর্থবহ করে তোলার জন্য কোন কোন মূল্যবোধের ওপর পরিবার গড়ে তোলা উচিত?

কোন মূলনীতিগুলো সাপ্তাহিক ও মাসিক পারিবারিক সভায় থাকা দরকার? ভ্রমণে বের হলে কিংবা সাপ্তাহিক ছুটিতে কোন ধরনের বিষয়গুলোর যথার্থ প্রয়োগ হওয়া উচিত?

এমন বহু পরিবার আছে যারা জীবনের বড় একটি অংশ অতিবাহিত হওয়ার পরও সন্তানদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শেখাতে পারে না—

» অন্যদের সাথে ব্যবহার

» মতভেদ হলেও একসাথে থাকা

» জীবনে নানা সমস্যার মুখোমুখি হওয়া

» পারিবারিক ভাঙন রোধে করণীয়

» আশপাশের মানুষগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা

» দায়িত্ব ও অধিকার-বিষয়ক জ্ঞান

» অধিকার আদায়ের যথার্থ সময়জ্ঞান ও পন্থা

এ ধরনের আরো অনেক বিষয় প্রতিটা পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকা বাঞ্ছনীয়। এমন যেন না হয়, ছেলেমেয়ে বড় হয়ে বিয়ে করে ফেলেছে অথচ এই মৌলিক বিষয়গুলোই জানে না, বড় বড় ব্যাপারগুলো তো অনেক পরের কথা।

একজন খতিব নিজের এলাকার মসজিদে প্রতি সপ্তাহে কোন কোন বিষয়ের ওপর আলোচনা করবেন তা নির্ণয়ে মনোনিবেশ করা তার কর্তব্য।

» প্রতি জুমার খুতবায় যে বিষয়ে আলোচনা করবেন, সেখানে কোন মৌলিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে?

» খতিব যদি টানা কয়েক সপ্তাহ তাওহিদের বক্তৃতা দেন এবং এ-সংক্রান্ত আলোচনা বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন, তাহলে এমন কিছু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হৃদয় মুসল্লিদের মাঝে খুঁজে পাওয়া সম্ভব যারা বাস্তবে যত বড় সমস্যার মুখোমুখিই হোক না কেন, দৃঢ় থাকবে।

» তার খুতবা থেকে ইসলামি মূল্যবোধের কী কী শিক্ষা নিতে পারে একজন মানুষ?

» খুতবার সাথে আত্মার পরিশুদ্ধি ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার সম্পর্ক কতটা হবে?

» খুতবার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর প্রতি সম্মান তৈরির বিষয়টা কতটুকু জায়গা করে নেবে?

আজ আমরা বিভিন্ন তত্ত্বকে দাঁড় করাতে না পারার যে ব্যর্থতা, তার একটা কারণ হলো এই সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলার কাজে আমাদের পশ্চাৎপদতা।

আপনি যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছেন, সেটাতে মনোযোগ নিবদ্ধ করা আপনার দায়িত্ব।

» আপনার পরিকল্পনার মূলনীতি কি মূল্যবোধের মানে উত্তীর্ণ?

» আপনার পরিকল্পনা কি কেবল পরিমাণের দিকে মনোযোগ দেয় নাকি গুণগত মানের ওপরও?

» পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার মনে কোন ধরনের প্রশ্নগুলো বেশি আসে? কতটুকু শেষ হলো নাকি কীভাবে কাজটা হলো এবং বাস্তবে আপনার পরিকল্পনা কেমন প্রভাব ফেলতে সক্ষম?

এভাবে আপনার সাধারণ ও বিশেষ প্রতিটা কাজের ক্ষেত্রে আপনার অনুভূতিতে মনোযোগ যেন জায়গা করে নেয়।

যে কর্মজীবী মানুষটি নিয়মিত কাজ করে, তারও তো মনোযোগ প্রয়োজন। নাহলে সে তার অফিস থেকে বের হবে ঠিকই, কিন্তু কিছু দরকারি কাজের ফাইল খোলার সময়ই তার হবে না। এমন বহু মানুষ আছে যারা একটানা দীর্ঘ সময় কাজ করে অথচ সেই কাজের কোনো ফল তারা জীবনে কখনো দেখতে পায় না। যে কারণে যার অধীনে কাজ করছে তার সাথে প্রায়শই ভুল বোঝাবুঝি হয়। অতএব, আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

যদি সেই কর্মজীবী মানুষটা নির্দিষ্ট অভ্যাস গড়ে নিতে পারত এবং প্রতিদিন অফিসে ঢোকার পর সে অনুযায়ী কাজ করত, তাহলে তার মন প্রশান্ত হয়ে উঠত, মাথা ঠাণ্ডা থাকত এবং ধীরে ধীরে কাজের প্রতি তার আগ্রহও বেড়ে যেত।

যে ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দেয়, তারও প্রয়োজন মনোযোগের।

» সে প্রতিদিন কী লিখবে? কোন বিষয়ে আলোচনা করবে?

» যোগাযোগ-মাধ্যমে সে কোন কোন মৌলিক জ্ঞানের প্রসার ঘটাবে?

» কোন ধরনের চিন্তার বিকাশ এখানে ঘটানো যাবে?

যদি কোনো মানুষ নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে সময় কাটায়, অথচ সে জানে না, সে কী করছে বা করবে, তাহলে সেটা তার জন্য বড় একটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যে ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে সময় দেয়, তার উচিত নিজের ব্যাপারে আরো বেশি সচেতন হয়ে ওঠা, যেন সে পাপের সাগরে নিমজ্জিত না হয় এবং তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়ে ওঠে।

যে ব্যক্তি পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে চায়, তারও এই গুণটি বিশেষভাবে থাকা চাই। আমাদের মাঝে অনেকে বিক্ষিপ্ত পড়াশোনায় অভ্যস্ত। তাই বছরের পর বছর চলে যায় অথচ কিছুই শেখা হয় না। ইতিহাস, সাহিত্য, চিন্তা, শিক্ষা-সহ নানা বিষয়ে পড়ার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করলে কেমন হতো? তারা যদি একটা ছক এঁকে, কাঠামো তৈরি করে, সময় বেঁধে নিয়ে সুবিন্যস্তভাবে বই পড়ার চেষ্টা করত, তাহলে সেই পড়া ভবিষ্যতে খুব কাজে দিত।

চিন্তার খোরাক

চিন্তা ও ক্ষেত্রের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আপনি যে কাজই করবেন, তাতেই প্রয়োজন মনোযোগের। যদি মনোযোগ না থাকে, তাহলে দিনশেষে আপনি ভালো কিছু পাবেন না।

ভারসাম্যে পরিপূর্ণ এক জীবন

এই বইয়ের শেষ পর্যায়ে এসে পাঠক জিজ্ঞেস করতে পারেন, লেখক যে মনোযোগের দিকে আহ্বান করেছেন, দেশ-বিদেশের নানা উদাহরণ টেনেছেন, শত শত উপমা আর উপকারিতা বর্ণনা করেছেন, সেটা কি আমাদের আশা পূরণ করতে পারবে? আমরা যত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি, তার সমাধান কি এখান থেকে পাব?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলব, এ অভ্যাসের কারণে আপনার দুই-তৃতীয়াংশ সময় আপনি নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং উপকারী চিন্তায় ব্যয় করতে পারবেন। জীবন পরিপূর্ণ হবে অনাবিল সুখের পরশে। আর অতিরিক্ত যে সময়টুকু হাতে থাকবে তা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

ভারসাম্য রক্ষা করা বেশ কঠিন কাজ। সফলতা অর্জন করা এবং মনোযোগ নিবদ্ধ করার অর্থ এই নয় যে, প্রচেষ্টা, চিন্তা আর ক্ষমতার পেছনে পুরো সময় ব্যয় করে ফেলবেন। অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য কোনো সময় থাকবে না—এমনটা নিশ্চয়ই হতে দেওয়া যাবে না। তাহলে কিছু দিনের মধ্যে আপনার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।

যখনই আপনার চিন্তা, পরিকল্পনা ও কাজে আপনি সফল হবেন, কিন্তু পরিবারকে অখুশি করবেন, কর্মে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে শুরু করবেন, আত্মীয়দের হক আদায়ে পিছপা হবেন, অথবা কোনো দায়িত্ব পালনে অনীহা আসবে, তখন আপনি ব্যর্থদের কাতারে চলে যাবেন। চিন্তা ও পরিকল্পনায় সফল হয়ে আকাশ ছুঁয়ে ফেললেও বাস্তবে আপনি একজন ব্যর্থ মানুষই থেকে যাবেন। প্রবল ভালোবাসায় যে মেঘ ছুঁয়েছেন, তার বজ্রাঘাতেই আপনার সুন্দর জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ভারসাম্য রক্ষা করতে পারাটা খুবই জরুরি। সব বিষয়কে আপনার গুরুত্ব দিতে হবে। যেকোনো ব্যাপারে উদাসীনতা কিংবা অবহেলার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে ব্যর্থতা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ভারসাম্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে—

‘তোমার রবের ওপর তোমার হক আছে। তোমার নিজের ওপর তোমার হক আছে। তোমার পরিবারের ওপর তোমার হক আছে। প্রত্যেকের হক যথাযথভাবে আদায় করো।’

সফল তো তারাই, যারা তাদের চিন্তা ও পরিকল্পনাকে জীবনে যথার্থরূপে বাস্তবায়ন করতে পারেন। তারা প্রত্যেক বিষয়ে নিপুণভাবে মনোযোগ দিতে পারেন। আবার একই সময়ে তারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সব ক্ষেত্রে তাদের চেষ্টা, কর্ম ও পরিশ্রমের সামঞ্জস্য ঘটে।

একজন মানুষের নিজস্ব পরিকল্পনার বাইরেও কিছু দায়িত্ব থাকে। আশপাশের মানুষের প্রতি তার হক থেকে যায়। আমাদের পরিপূর্ণ বুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ তখনই ঘটবে যখন আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দেবো, কোথাও কোনো প্রকার ঘাটতি রাখব না।

চিন্তার খোরাক

আপনার দিনের দুই-তৃতীয়াংশ সময় যেন আপনার চিন্তা, স্বপ্ন, লক্ষ্য, পরিকল্পনা, খাত ও দক্ষতায় ব্যয় হয়। বাকি সময়টা ভারসাম্য রক্ষার কাজে। এভাবে প্রত্যেকটা বিষয়কে যতটা গুরুত্ব দেওয়া দরকার, তার চেয়ে একবিন্দুও কম দেবেন না।

মনোযোগ লাভের কার্যকরী পন্থা

মনোযোগ লাভের সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হলো আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুখী হতে চায়, তাকে আল্লাহর সাথে উত্তম সম্পর্ক গড়ে তুলতেই হবে।

পেছনের অধ্যায়গুলোতে মনোযোগ অর্জনের যত কলাকৌশল বলা হয়েছে তার সবই নির্ভর করে এই বিষয়টির ওপর। যে এটি অর্জন করতে পারবে না, তার বাকি সব অর্জন বৃথা।

এটিই জীবনের প্রকৃত অর্থ, সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য। যদি কারো ন্যূনতম জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে, সে যেন এর আঙিনায় নিজেকে স্থাপন করে নেয়। এক মুহূর্ত সময়ও যেন হাত ফসকে পালিয়ে না যায়। সময় যতই অতিবাহিত হোক, বসন্ত একদিন আসবেই জীবনে।

আপনি যদি আপনার কোনো স্বপ্ন পূরণ করতে চান, তাহলে মসজিদমুখী হতে শিখুন। সালাতের হক আদায় করুন। যখনই শুনতে পাবেন 'হাইয়্যা আলাস সালাহ',

তখন যত ব্যস্ততাই আপনাকে ঘিরে থাক না কেন, ক্ষণিকের জন্য সেসব ব্যস্ততা দূরে সরিয়ে রাখুন। আপনি কোন সভায় আছেন, তার পরোয়া করবেন না। হৃদয়ের আহ্বান ও মনের প্রশান্তির পথে যা কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাকে কখনো গুরুত্ব দেবেন না। যে ব্যক্তি এমন কিছুকে গুরুত্ব দেয়, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন! আর যে ব্যক্তি সুখের সময়েও আল্লাহকে আকুলভরে স্মরণ করে, আল্লাহ তাকে দুঃসময়ে আগলে রাখেন।

আমাদের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আগ্রহ মিশে আছে। সিজদায় গিয়ে কিংবা দুআয় যখন মহান রবকে আহ্বান করা হয়, তখন যে স্বাদ পাওয়া যায়, তার বিবরণ শুধু সেই দিতে পারবে যে তা অনুভব করেছে দুনিয়ার বুকে। আর যদি তার সাথে যুক্ত হয় একান্তে নফল সালাত পড়া কিংবা শেষ রাতে জায়নামাজে কিছু সময় কাটানো, তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। সেই সাথে কেউ যদি এ কাজটি অভ্যাসে পরিণত করতে পারে, তাহলে সে দুনিয়ায় থেকেই জান্নাতের খানিকটা নিয়ামত পেয়ে গেল।

আপনার হৃদয়কে কুরআনের আঙিনায় ছেড়ে দিন। কুরআনের সাথে বেশ ভালো একটি সম্পর্ক গড়ে তুলুন। কুরআনের কিছু পৃষ্ঠা তিলাওয়াত করাকে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত করুন। প্রতিদিন কুরআন নিয়ে ভাবার যেন নির্দিষ্ট সময় থাকে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আপনি ধীরে ধীরে অনুভব করবেন, সব কিছু পেয়ে গেছেন। এমন অনাবিল প্রশান্তির স্বর্গীয় স্বাদ আর কিছুতেই পাবেন না।

আল্লাহর আনুগত্য (সালাত, সিয়াম, সাদাকা, যিকর, তিলাওয়াত, তাদাব্বুর, আত্মীয়তার সম্পর্ক, উমরাহ) যত রকমের হতে পারে, সবগুলোতে যেন আপনার সামান্য হলেও অংশ থাকে। আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান করুন। হৃদয়ের গভীরে অনুভব করতে থাকুন। যদি আপনার রব এবং তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে কোনো আদেশ জানতে পারেন, তবে তা পালনে আত্মনিয়োগ করুন।

যে কাজে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জনের সামান্যতম আশঙ্কা থাকে, তা নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিন। হারাম কাজ থেকে আরো দূরে থাকুন। আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খেয়াল রাখুন। কোনো পাপ কাজে ভুলেও জড়াবেন না। হ্যাঁ, যদি অভ্যাসবশত কিছু হয়ে যায়, সেটা ভিন্ন কথা। আশা করা যায়, পরম করুণাময় তা নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। এভাবে চলতে থাকলে ধীরে ধীরে আপনার জীবনে বাধাগুলো সরে যাবে।

শাইখ মাশআল আব্দুল আজিজ আল-ফাল্লাহি। ব্যক্তিজীবনে তিনি ৬ সন্তানের জনক। শারিয়াহ বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মক্কা মুকাররমা থেকে। লেখক বর্তমানে পিএইচডি অধ্যয়নরত। ১৪২২ হিজরিতে সৌদির হালি উপত্যকায় স্থাপিত 'জমইয়াতুল বিররিল খাইরিয়াহ'র প্রতিষ্ঠাকালীন সেক্রেটারি তিনি।

পাশাপাশি 'মাজলিসু ইদারাতি মাকতাবিদ দাওয়াহ'র হালি শাখার প্রধান নির্বাহী এবং একই অঞ্চলের 'জমইয়াতু তাহফিযিল কুরআন'-এর সহকারী পরিচালক পদে নিযুক্ত রয়েছেন। তার রচিত কয়েকটি অসাধারণ গ্রন্থ হচ্ছে— 'আত-তারকিয', 'মাশরুউল উম্‌র', 'রামাদান ইয়াবনিল কাইয়িম'।

সমকালীন প্রকাশন

■ যদি মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে জীবনপথে অগ্রসর হতে চান, যদি মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চান, যদি মেধাকে আরো বেশি বিকশিত করতে চান, তবে এ বইটির চেয়ে ভালো বন্ধু আর একটিও খুঁজে পাবেন না আপনি। এ বইয়ের চমৎকার টিপস এন্ড ট্রিকস আপনার জীবনে ভিন্ন মাত্রা এনে দেবে।

■ আপনি কি প্রায়ই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন? কিংবা কোনো কাজ হাতে নিয়ে পরে গড়িমসি করেন? যদি তা-ই হয়ে থাকে, তবে এমন বই কখনো হাতছাড়া করবেন না।

MDH

বিক্রয়কেন্দ্র :
১১/১, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৪০৯-৮০০-৯০০

সমকালীন প্রকাশন